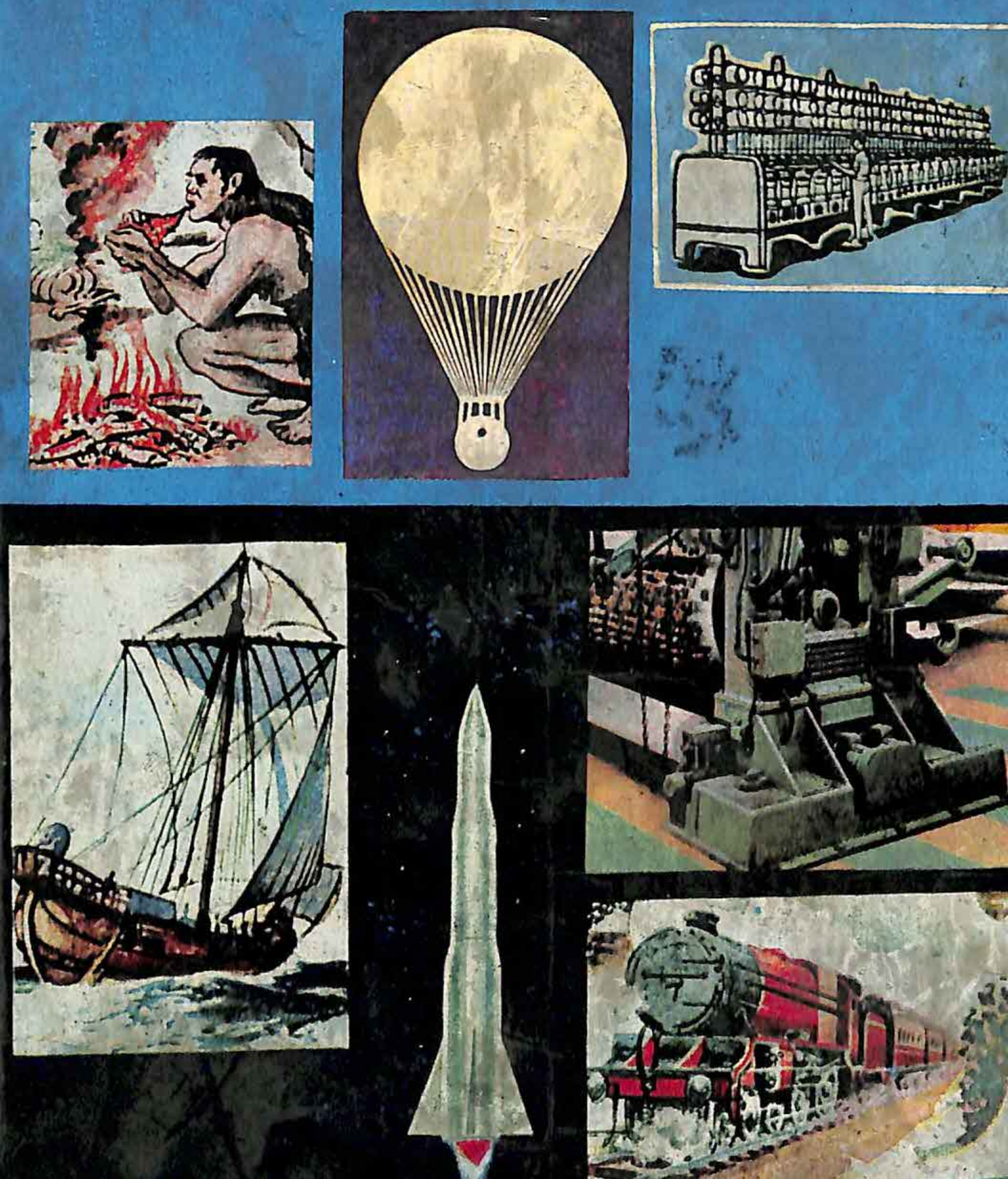
বিজ্ঞানের সহজ পাঠ

সুধাংশু পাত্র



বিজ্ঞানের সহজপাঠ

বিজ্ঞানের সহজপাঠ

সুধাংশু পাত্র

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ :
বইমেলা
জানুয়ারী, ১৯৮৭

প্রকাশক :
সুভাষচন্দ্র দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ :
গৌতম রায়

মুদ্রাকর :
অন্নপূর্ণা পাল
শ্রীদুর্গা প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১৮ ডাঃ কার্তিক বোস স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০০৯

দাম : ১২ টাকা

আজকের দিনে বিজ্ঞানের অবদানের যেন কোন তুলনাই হয় না। ঘর-গৃহস্থালীর জিনিসপত্র থেকে পরনের বস্ত্র, ওষুধ, যানবাহন, রাস্তাঘাট, আনন্দোপকরণ প্রভৃতি সবকিছুর মধ্যে লুকিয়ে আছে বিজ্ঞানের অসীম করুণা। বিজ্ঞানের এই অপ্রতিহত জয়যাত্রার পুরোভাগে দাঁড়িয়ে যদি একবার পেছন পানে তাকানো যায়, তাহলে দেখা যাবে প্রতিটি আবিষ্কারের পেছনে আছে মানুষের সুদীর্ঘকালের সাধনা ও অধ্যবসায়। এমনকি বহু মহান আবিষ্কারের বীজ নিহিত হয়েছিল মানবসভ্যতার একেবারে উষালগ্নেই। তারপর কতভাবে কত চিন্তা ও গবেষণার ফলে আজকের বিজ্ঞানের এই মহামহীরূহ।

আমাদের চারপাশে বস্তুরাশির প্রতি প্রতিটি কিশোর মনের দুর্বার কৌতূহল। সীমিত তাদের জ্ঞান অথচ অজানাকে জানার জন্য অনুভব করে প্রবল আকর্ষণ। তাই আজকের বিজ্ঞান সভ্যতার উপাদানগুলিকে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ ও একত্রিত করে একটু সহজভাবে পরিবেশন করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি মাত্র। এতে কোন কৃতিত্ব আমার নেই। কিশোর মনের ক্ষুধা যদি কিছুটা নিবৃত্ত হয় এবং যদি একটুখানি বিজ্ঞান-মনস্ক হয়ে উঠে তাহলে সার্থক হবে আমার প্রচেষ্টা।

—লেখক

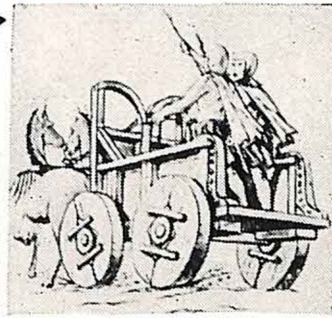
লেখকের লেখা অন্যান্য বিজ্ঞানগ্রন্থ ঃ

প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞানী
ভারতের বিজ্ঞানসাধক ১ম, ২য় ও ৩য়
বিজ্ঞানচর্চায় প্রাচীন ভারত ও সমকালীন অন্যান্য দেশ
উদ্ভিদ রাজ্যের খবর
পৃথিবী পরিচয়
আবিষ্কারের কাহিনী
পৃথিবী মানুষ ও মহাকাশ
বিজ্ঞানী প্রসঙ্গ
বিজ্ঞানী চরিতকথা
বিজ্ঞানের অমর প্রতিভা
ছোটদের বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসা
আরও বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসা
পদার্থ বিজ্ঞানের সহস্র জিজ্ঞাসা
মনের মত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের গপ্পো
ভৌগোলিক আবিষ্কার ও অভিযান
মহাকাশ বিদ্যা ও কৃত্রিম উপগ্রহ ব্যবস্থা
বিশ্ব পরিবেশ ও মানুষ
জীবনের জয়যাত্রায় মানুষ
জীবজগতের বিস্ময়
বিজ্ঞানের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত
মহাকাশের হাজারো প্রশ্ন
জীবজন্তুর গপ্পো

সূচীপত্র

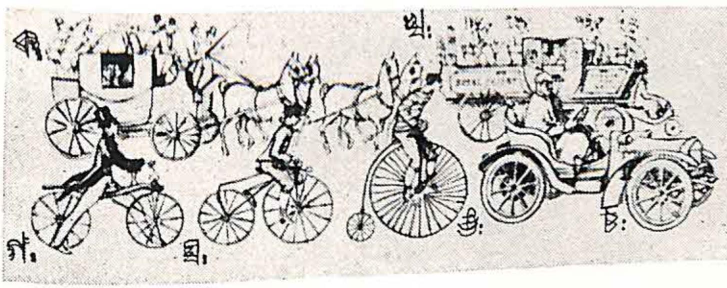


খৃ: পূ: ২০০০ অব্দে ব্যাবিলনীয়দের ব্যবহৃত রথ ▶



▼ চাকার ক্রমবিকাশ

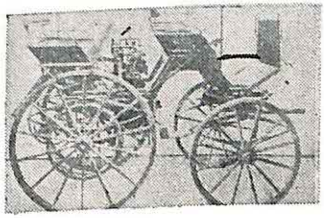


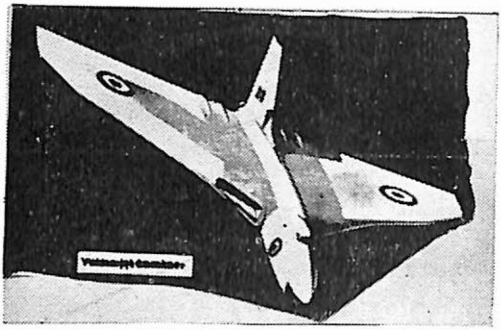


ক • প্রথম ঘোড়ায় টানা যাত্রীবাহী গাড়ী (১৮০০ সাল)
খ • প্রথম বাষ্পচালিত যাত্রীবাহী গাড়ী (১৮২৫ সাল)
গ • প্রথম সাইকেল ড্যান্ডি হর্স (১৮১৮ সাল)
ঘ • বেন সেকার (১৮৬৫ সাল)
ঙ • পেনি ফার্দিং (১৮৮০ সাল)
চ • প্রথম মোটর গাড়ী (১৯০০ সাল)

▼ প্রথম উন্নত রাস্তা ও সেতু নির্মাতা টমাস টেলফোর্ড





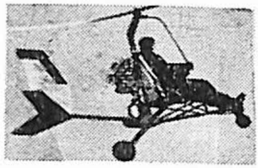




বর্তমানের নানাধরনের











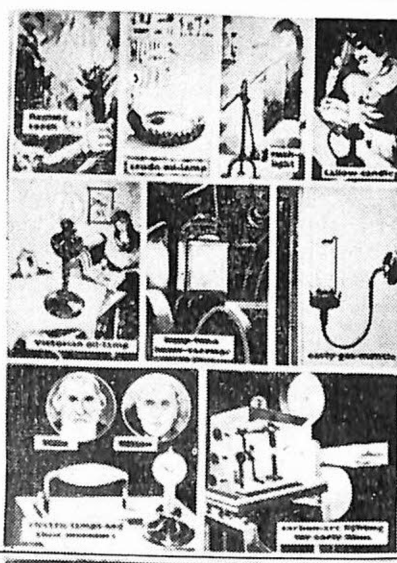
উড়োজাহাজ



কাঠের আলো

কাঠের আলো থেকে বৈদ্যুতিক আলো

১ কাঠের চেলা জ্বেলে আলো
২ প্রথম প্রদীপের আলো
৩ রাশ লাইট
৪ মোমবাতি
৫ ভিক্টোরিয় যুগের উদ্ভিজ্জ তেলে প্রজ্বলিত আলো
৬ ঘোড়ার গাড়ীতে ব্যবহৃত লণ্ঠন
৭ প্রথম গ্যাস আলো
৮ এডিসন ও স্বোয়ান এবং তাঁদের তৈরী বৈদ্যুতিক আলো
৯ প্রথম কারবন আর্ক লাইট



বৈদ্যুতিক আলোকমালায় সুসজ্জিত একটি রাস্তা

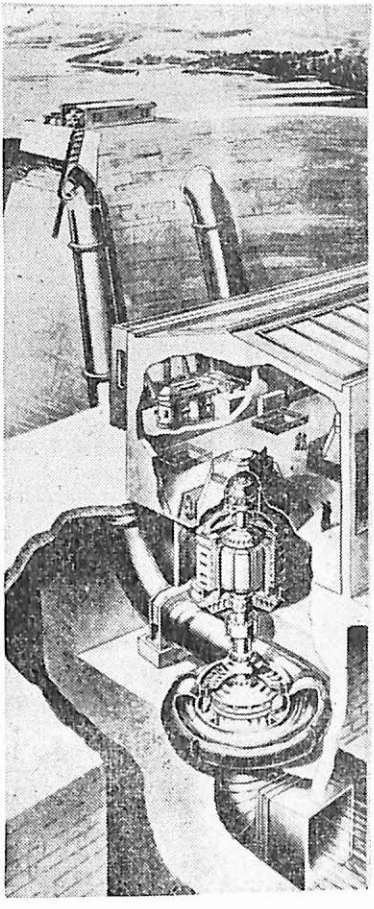




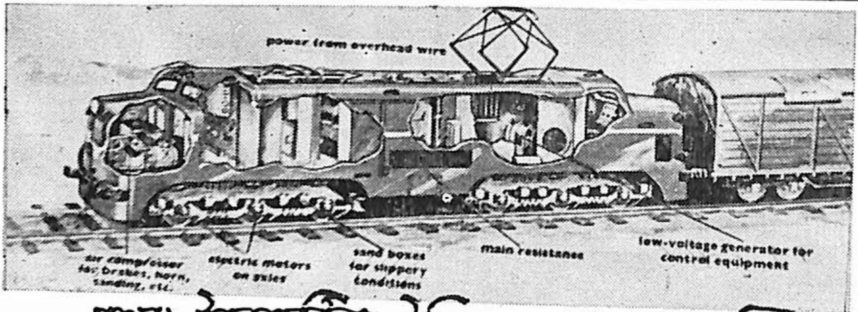
রাতে খেলার জন্য ফ্লাস লাইট

লাইট হাউস ►

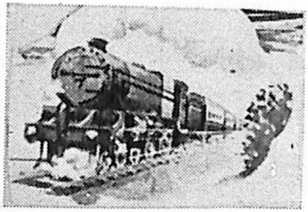




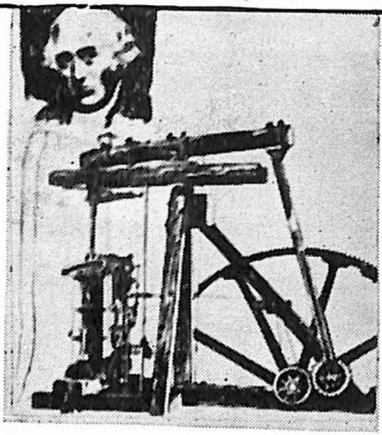
জলে বিদ্যুৎ তৈরী হচ্ছে



প্রথম ইলেকট্রিক ইঞ্জিন ও তার যন্ত্রপাতি

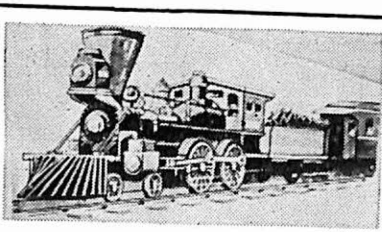


কয়লার দ্বারা চালিত রেল ইঞ্জিন



◂ জেমস ওয়াট এবং তাঁর বাষ্পচালিত ইঞ্জিন

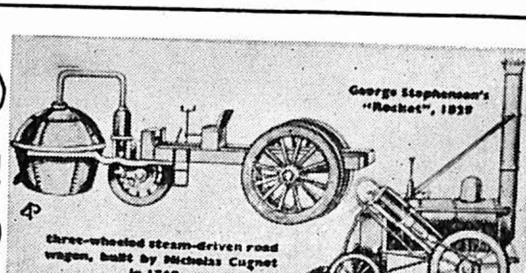
প্রথম কাঠ পুড়িয়ে

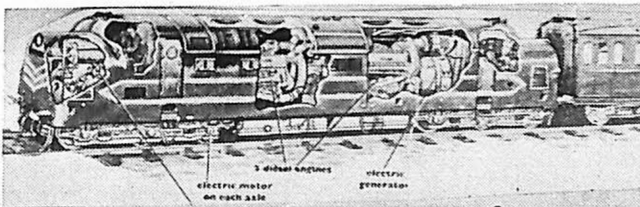


যে রেল ইঞ্জিন চালানো হয়েছিল (১৮৪০ সাল)

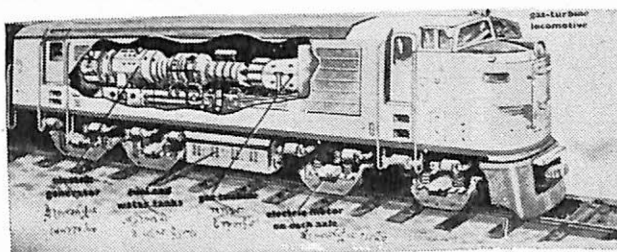
ক. নিকোলাস কুনোর গাড়ী (১৭৬৯)

খ. জর্জ স্টিফেনসনের রকেট গাড়ী (১৮২৯)

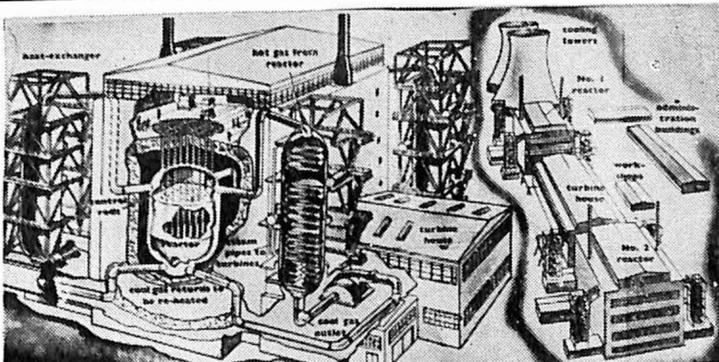




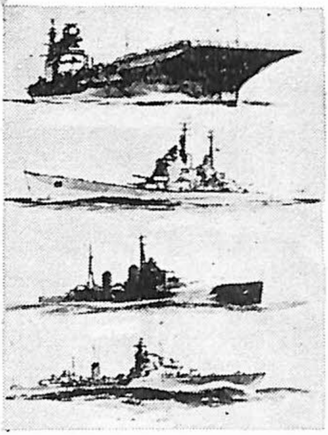
ডিজেল টানা ইনজিন
ও তার যন্ত্রপাতি



গ্যাসটারবাইন
ইনজিন (আমেরিকায় উদ্ভুত)



নিউক্লিয়ার পাওয়ার স্টেশনের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি

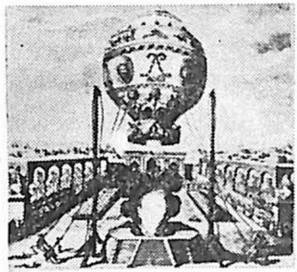


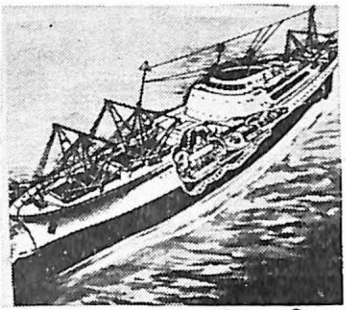
যুদ্ধ জাহাজ সমূহ



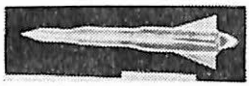
• ১৯৩২ সালে পিকার্ডের তৈরী বেলুন

মঁগল ফিয়ে ভাইদের তৈরী বেলুন এবং যে ভাবে তাতে গরম বাতাস ঢোকানো হয়েছিল





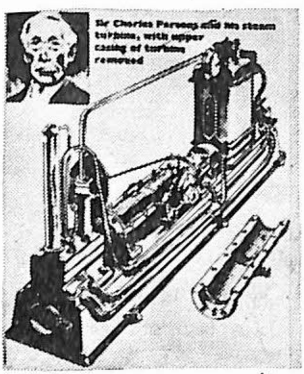
প্রথম পরমানুশক্তি চালিত জাহাজ - আমেরিকা



রকেট (পাইয়োনিয়ার ৫)



রোমান আমলের জাহাজ



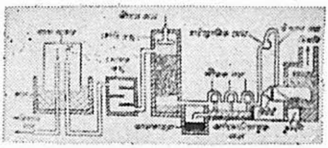
চার্লস পারসন এবং তাঁর গ্যাস টারবাইন



প্রাচীন গ্রীকদের জাহাজ

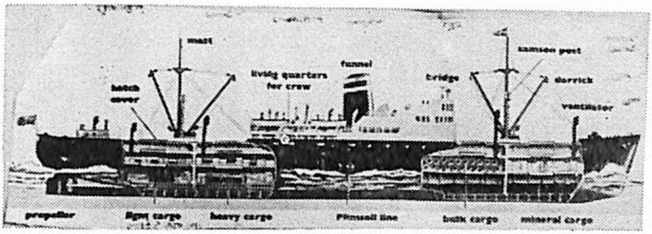


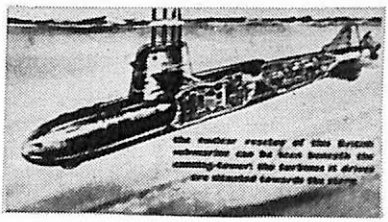
ভাইকিংদের জাহাজ



কোল গ্যাস পদ্ধতি

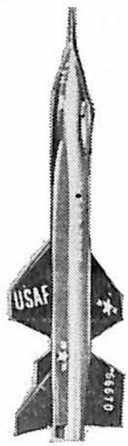
জাহাজের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি

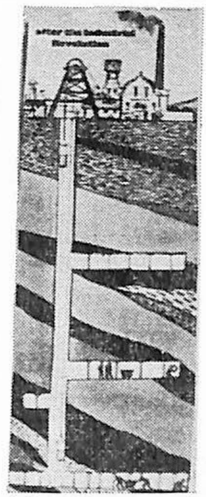




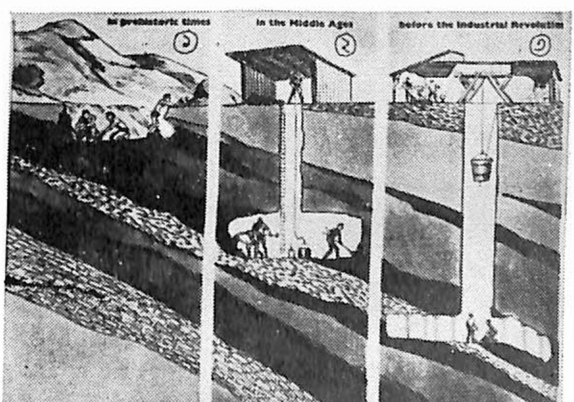
পরমানুশক্তি পারিচালিত সাবমেরিন

রকেট →





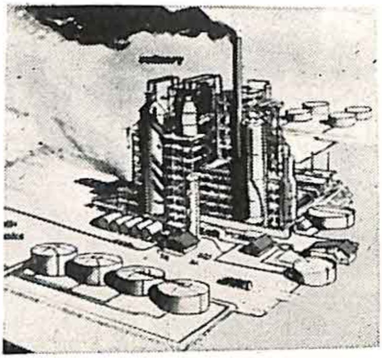
শিল্প বিপ্লবের পর কয়লা উত্তোলন



১ প্রাগৈতিহাসিক যুগের খনি

২ মধ্যযুগের খনি

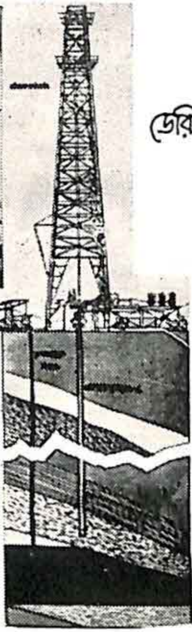
৩ শিল্প বিপ্লবের আগে খনি থেকে কয়লা উত্তোলন



পেট্রোলিয়াম শোধন করা হচ্ছে



▲ পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধান



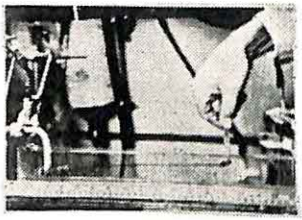
পেট্রোলিয়াম উত্তোলিত হচ্ছে



ভেড়ার লোম সংগ্রহের আধুনিক পদ্ধতি

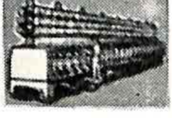


অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র বিশিষ্ট যন্ত্র – যার ভেতর দিয়ে চালনা করে কৃত্রিম তন্তু তৈরী করা হয়



কৃত্রিম তন্তু তৈরীর গবেষণাগার

প্রথম হাতে সূতা কাটা ▼



আধুনিক সুতা কল





স্পিনিং জেনি

চাকা থেকে গাড়ী

বড় রাস্তায় পা দিলে যারা তোমাদের মনকে কেড়ে নেয়, যাদের দেখে চোখ ফেরাতে পার না এবং দেখে দেখেও আশ মেটে না, তারা হচ্ছে রঙ-বেরঙের গাড়ী। গাড়ী দেখতে আনন্দ, গাড়ীতে চাপতে আনন্দ, আর চালক যখন কল-কব্জা নেড়ে গাড়ীকে চালিয়ে নিয়ে যায়—তাও দেখে আনন্দ।

তোমাদের প্রায়ই চোখে পড়ে, কালো ঢেউখেলানো পিচঢালা পথের উপর দিয়ে হুস্ হুস্ শব্দে ধোঁয়া ছড়াতে ছড়াতে এগিয়ে যায় কালো, ধূসর, সাদা, নীল প্রভৃতি কত রঙ-বেরঙের এবং কত ধরনের বাস, লরি, টেম্পো, ট্যাক্সি, সাইকেল ও মোটর সাইকেল; দু-খানা লোহার পাতের উপর দিয়ে ঝিক্‌ঝিক্ করতে করতে ছুটে চলে রেলের গাড়ী; মাথার উপর ঘর্ঘর শব্দে চারদিক সচকিত করতে করতে তীব্রবেগে আকাশ পরিক্রমা করে কত হরেক রকমের বিমান। আর তাদের ছুটে চলার সাথে সাথে তোমাদের মনটাও কোন এক অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি দিতে চায়, বুঝি বা নিরুদ্দেশ হতে চায়। হয়ত মনে মনে ভাবতে থাক, হায়রে হায়! আমারও যদি এমনই একটি গাড়ী কিংবা উড়োজাহাজ থাকতো, নিদেনপক্ষে কোন একটা গাড়ীর যদি চালক হতে পারতেম—তাহলে কী মজাটাই না হতো?

হাঁা, লেখাপড়া শিখলে গাড়ী হয়, গাড়ীতে-উড়োজাহাজে চাপা যায় এবং গাড়ীর চালকও হওয়া যায়। জানো নিশ্চয়ই, গাড়ী আমাদের প্রচণ্ড স্থবিধে করে দিয়েছে। দূর-দূরান্তরে যেতে ও মালপত্র বহন করতে আজ ডাঙায় মোটরগাড়ী ও রেলেরগাড়ী, জলে জাহাজ ও স্টীমার, আকাশে উড়োজাহাজ যেন ওৎ পেতে বসে আছে। কত অল্প সময়ের ভেতরে কত দূর দূর দেশে চলে যেতে পারছি আমরা! চিকিৎসার জন্যে, বাজার-হাটের জন্যে, ব্যবসার জন্যে, চাকরির জন্যে ও লেখাপড়ার জন্যে আমরা রীতিমত ওদের বশীভূত হয়ে পড়েছি। হাঁটার প্রাণান্তকর পরিশ্রম লাঘব হয়েছে, জীবন গতিশীল হয়েছে, আর যা ছিল দূর তা আজ হাতের মুঠোয় এসে গেছে। যেন ছোট হয়ে গেছে আমাদের এই বিশাল পৃথিবীটা।

এমনটি কিন্তু চিরকাল ধরে চলে আসছে না। এমন একদিন ছিল, যেদিন মানুষকে কেবল হেঁটেই পথ অতিক্রম করতে হতো। মালপত্র বহন করতে হতো পিঠে, ঘাড়ে, নয়ত মাথায়। পথও সেদিন এত সুন্দর ছিল না। এবড়ো-খেবড়ো পথে, চড়াই-উৎরাই পার হয়ে, খরা-বর্ষা মাথায় করে কেবল হাঁটা—হাঁটা—আর হাঁটা। বিপদও ছিল পদে পদে। পায়ে হোঁচট লাগার ভয়, সাপ-খোপ-বন্য জন্তুর ভয়, কাঁটায় পদতল ক্ষত-বিক্ষত হওয়ার ভয়, এবং সবচেয়ে বড় ভয় ছিল দস্যু-তস্করের। গাড়ী হওয়ায় কত দিক থেকে কতই না সুবিধে ভোগ করছি আমরা। আর এই যে সুবিধে—এর পেছনে আছে কত সহস্র সহস্র বছরের তপস্যা, কত সহস্র মানুষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও অধ্যবসায় এবং কত সহস্র জনের ত্যাগ। শুধু তাই নয়, এইসব আবিষ্কারের পেছনে কত অমূল্য জীবন যে অকালে ঝরে গেছে তারও হিসেব খুঁজে পাওয়া যাবে না। দধিচীর মত এঁরা শুধু দিয়েই গেছেন—পাননি কিছুই।

জন্মের অব্যবহিত পরে মানুষ যেমন হাঁটতে পারে না, বীজ থেকে চারা বেরুবার সাথে সাথে যেমন সে শাখা-প্রশাখা ও ফুল-ফল ধারণ করতে পারে না, তেমনই মানবসভ্যতার ঊষালগ্নে এগুলি কিছুই ছিল না। মানুষের সুদীর্ঘকালের অধ্যবসায় ও অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করে মাত্র শ-দুয়েক বছর আগে দূরত্বকে বধ করার শুভ সূচনা হয়েছে। তার আগের ঘটনা—মানুষের কেবল একটানা দুঃখের ও কষ্টের কাল। এককালে মানুষ বুদ্ধি খরচ করে পালতোলা নৌকা ও জাহাজ তৈরি করেছিল সত্য, কিন্তু ডাঙায় কোন দ্রুতগামী যান ছিল না। কোনকিছুকে বহন করতে হলে হয় নিজেকে, নয়ত কোন লোকজনকে অথবা পশুকে নিয়োগ করতে হতো।

মানুষের চেয়ে পশুর শক্তি যে বেশী এবং তারা সহজে যে ক্লান্ত হয়ে পড়ে না, এই তথ্যটুকু সংগ্রহ করতেই মানুষের লেগেছে কত হাজার হাজার বছর। অবশেষে মাত্র হাজার ছয়েক বছর আগে হাঁটার ও মাল বহনের কষ্টকে লাঘব করতে মানুষ নিয়োগ করেছিল পশুশক্তিকে। প্রথম প্রথম তারা শিকারের জন্য কুকুরকে পোষ মানিয়েছিল, দুধ ও মাংসের জন্য পোষ মানিয়েছিল বলগা-হরিণকে, অবশেষে ভূমিকে কর্ষণ করতে ও অন্যান্য কাজের জন্য পোষ মানিয়েছিল গবাদি পশুকে। সবশেষে এনেছে ঘোড়া, উট, গাধা ও হাতীকে। প্রকৃতপক্ষে আজ থেকে মাত্র দু-শ' বছর আগে পর্যন্ত ওরাই ছিল আমাদের একমাত্র অবলম্বন।

আজকে ডাঙায় কলের গাড়ী, আকাশে উড়োজাহাজ—যারা মানুষের জীবনকে

গতিশীল করেছে, নিরাপত্তা ও আরাম এনে দিয়েছে, তাদের আগে ছিল হাতে ঠেলা গাড়ী, পশু কিংবা পশুতে টানা গাড়ী, কাঁধে বহনের উপযোগী পালকি-চতুর্দোলা প্রভৃতি। এই ব্যবস্থা যে অতি প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছিল—তার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে অনেক জায়গায়। পণ্ডিতদের মতে খ্রীষ্টজন্মের প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে মানুষ গাড়ী টানতে নিয়োগ করেছিল পশুকে।

আগেকার সেই পশুতে টানা গাড়ীই হোক আর আজকের কলের গাড়ীই হোক—সবার তলায় পরানো থাকে চাকা। নিরেট কাঠের চাকা, পাখী বা স্পোকওয়ালা চাকা, লোহার ও লোহার বেড় পরানো চাকা, টায়ার ও টিউব পরানো চাকা, কত হরেক রকমের চাকাই না আমরা দেখতে পাই! অথচ গাড়ীর ঐ চাকাটাই হচ্ছে আসল জিনিস। পা না থাকলে জীব যেমন চলতে পারে না, ডানা না থাকলে পাখী যেমন উড়তে পারে না, তেমনই চাকা না থাকলে গাড়ীও অচল।

তবে চাকাবিহীন গাড়ী একেবারে যে নেই এমন নয়। অনেক-অনেককাল আগে পাহাড়ের ঢালু পথ বেয়ে অথবা বরফের উপর দিয়ে সর সর করে এগিয়ে যাওয়ার জন্য মানুষ চাকাবিহীন এক ধরনের গাড়ী তৈরি করেছিল। দেখতে ছিল অনেকটা মুখখোলা বাক্সের মত। আরোহী বসতো বাক্সের ভেতরে এবং তাকে টানতো কুকুর বা বলগাহরিণ। নাম শ্লেজ গাড়ী। এখনও বরফের বাসিন্দা—সেই এস্কিমোরা ব্যবহার করে।

যেখানে বরফ পড়ে না, যেখানে ঢালু পথ নেই বা পথের উপরিভাগ সমান নয়, সেখানে শ্লেজের ভারি অসুবিধা। তাছাড়া শ্লেজ টানতে প্রচুর শক্তি ব্যয় হয়। তলার ঘর্ষণকে উপেক্ষা করা চাট্টিখানি কথা নয় কিনা! তাই শ্লেজের একজন মাত্র আরোহীকে টানতে বেশ কয়েকটি পশুর দরকার। আর মানুষ যেদিন এই মাটির ঘর্ষণের কথা উপলব্ধি করেছিল, সেইদিনই স্থির করেছিল এই জাতীয় গাড়ী টানতে অধিক সংখ্যক পশুকে নিয়োগ করলেও ভ্রমণের ষোলআনা আনন্দই মাটি হয়ে যায়। তাই বুদ্ধি খরচ করে মাটির ঘর্ষণকে এড়াতে একদিন কাঠের চাকার পরিকল্পনা করেছিল।

চাকার পরিকল্পনা কবে কোন কারিগরের মাথায় যে এসেছিল, কোন্ শিল্পী যে গাড়ীর তলায় সুন্দর করে চাকাকে পরিয়ে দিয়েছিলেন, আর কোন্ সৌভাগ্যবান যে প্রথম গাড়ীতে আরোহণ করেছিলেন—তা কারও জানা নেই। শিল্পীর শুধু শিল্পকর্মটুকুই অমর হয়ে আছে। অথচ মানুষের যাতায়াতকে সহজ করতে,

ভারি জিনিসকে বহে নিয়ে যেতে, গতির আনন্দকে উপভোগ করতে যিনি প্রথম চাকা তৈরি করেছিলেন—তাঁর তুল্য আবিষ্কারক কেউ নন। মানবসভ্যতার রূপটাকেই যেন পুরোপুরি পরিবর্তন করে দিয়েছেন। অপরদিকে এক নতুন যুগের সূত্রপাত করেছেন তিনি এবং তাঁরই কৃপায় মানুষ জীবজগতের মধ্যে একচ্ছত্র সম্রাট হয়েছে। কত সহস্র সহস্র বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, কত উত্থান-পতন হয়েছে, যানবাহনের কত উন্নতি এবং কত অদ্ভুত অদ্ভুত যন্ত্র আবিষ্কার হয়েছে, তবু মহাকালের রথের মত জলে-স্থলে-আকাশে প্রতিনিয়ত কত চাকা চরকির মত ঘর্ ঘর্ করে ঘুরছে। মেসিনে, গাড়ীতে, প্রপেলার রূপে বিমানে, ইঞ্জিনের টারবাইনে, কোথায় নেই চাকা? চাকা ছাড়া পুরো সভ্যতাই যেন ফাঁকা।

গবেষকদের মতে চাকা প্রাগৈতিহাসিক যুগের আবিষ্কারগুলির মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। তবে অপর দশটি আবিষ্কারের মত চাকা একদিনে, এক-আধ বছরে, এমনকি এক-আধ হাজার বছরেও হয়নি। কাঠের গুঁড়ি থেকে চাকা আসতে লেগেছে কম করেও হাজার পাঁচেক বছর। অপরদিকে চাকা থেকে পশুতে টানা গাড়ী এবং পশুতে টানা গাড়ী থেকে কলের গাড়ী আসতে প্রতিটি ক্ষেত্রে লেগেছে সেই পাঁচ হাজার বছরের মত সময়।

কিন্তু চাকা কেমন করে তৈরি হয়েছিল এবং আদিকালের চাকা কেমন ছিল, সে সম্বন্ধে নিশ্চয়ই তোমাদের জানতে ইচ্ছে করছে। আবার হাতে-নাতে তার প্রমাণও চাই। কেননা, কল্পনায় মন ভুলে না তোমাদের।

তবে ব্যাপারটা কি জানো? কাঠ দীর্ঘকাল মাটি চাপা থাকলে একেবারে মাটির সঙ্গে মিশে যায়। তাই অতীতের সভ্যতাগুলির যেসব ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে, তা থেকে কাঠের চাকা খুব কমই পাওয়া গেছে। এখান-ওখান থেকে পাওয়া মাত্র দু-চারটে চাকা এবং সেদিনের মানুষের আঁকা কিছু কিছু ছবি থেকে গবেষকরা চাকার আদিম রূপটি সম্বন্ধে পরিচিত হতে পেরেছেন।

বিভিন্ন নমুনা থেকে জানা গেছে, আদিতে চাকা তৈরি হতো নিরেট কাঠের। গাছের মোটা মোটা গুঁড়িকে কেটে গোল-গোল চাকতির মত করতো। পাথরের ভোঁতা হাতিয়ার দিয়ে তৈরি করতো বলে মসৃণ বড় একটা হতো না। অনেকটা জগন্নাথদেবের রথের চাকার মতই ছিল। অথবা বলা যেতে পারে রথের চাকাই তার আদিম রূপটাকে বজায় রেখেছে।

প্রথম প্রথম মানুষ চাকাকে গাড়ীর সঙ্গেও যুক্ত করেনি। চাকা দিয়ে হাঁড়ি-কলসি তৈরি করতো। এককথায় চাকা প্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল কুমোরের চাক হিসেবে।

চাকা তৈরি এবং চাকাকে পরিবহনের কাজে নিয়োগ করার পেছনে বেশ একটু ইতিহাস আছে। আজ থেকে প্রায় দশ-বার হাজার বছর আগে মানুষ যখন গুহা ছেড়ে খোলা আকাশের তলায় দাঁড়িয়েছিল; নদী কিংবা হ্রদের তীরে ঘর বাঁধতে শুরু করেছিল; সেদিন কাঠের ভেলা তৈরির জন্য, জ্বালানীর জন্য, বাসগৃহ তৈরির জন্য, মোটা মোটা গাছের গুঁড়িকে বহে আনতে হতো। তাছাড়া হাতিয়ার তৈরির জন্য পাহাড় থেকে পাথর আনতে হতো, দূর বন থেকে শিকার করা পশুদের বহে আনতে হতো, এমনই আরও কত কি? সেদিন পথঘাট ছিল না। গাছপালা, ঝোপঝাড় ও ঘাসলতা দিয়ে ঘেরা এবড়ো-খেবড়ো সরু পায়ে চলা পথে সবকিছুকে ঘাড়ে করে বহে আনতে হতো। সেদিনের মানুষ ভয় কাকে বলে জানতো না এবং কোন কঠিন কাজকে কঠিন বলে মনে করতো না। যখনই অসুবিধার সম্মুখীন হতো তখনই কোন-না-কোন কৌশল অবলম্বন করতে যত্নবান হয়ে উঠতো। আর ঐ কারণেই কোন ভারি বস্তুকে বহে আনতে এক অদ্ভুত উপায় আবিষ্কার করেছিল। গাছের ছোট ছোট ডালকে কেটে, বুনো লতা দিয়ে বেঁধে অনেকটা ভাড়ার মত করতো এবং সেই ভাড়ার উপর ভারি বস্তুকে রেখে টানতে টানতে নিয়ে আসতো বাসায়।

আরও একটা অভিজ্ঞতা হয়েছিল তাদের। পাহাড় থেকে ভারি পাথরের চাঁইকে একটু ঠেলে দিলে গড় গড় করে গড়িয়ে পড়তো তলায়, গাছের গুঁড়িকে বহন করা অপেক্ষা মাটিতে গড়িয়ে গড়িয়ে আনা সহজ ছিল, তাই এক মজার ব্যাপার করতো তারা! বেশ কয়েকটা মোটা ও শক্ত ডাল-পালা সংগ্রহ করতো এবং সেগুলিকে পাশাপাশি একটার পর একটা—এইভাবে মাটিতে পাতিয়ে দিত। আর সেই গোল-গোল ডালপালার উপর দিয়ে ভারি ভারি পাথরের চাঁইকে বহে আনতো।

ভাবছো বুঝি, সারা পথটা তারা গাছের ডাল কেটে সাজিয়ে রাখতো? না, না। মাত্র খানকয়েক হলেই কাজ চলতো। যতই চাঁইটা সামনে এগিয়ে আসতো ততই পেছনেরগুলো আলগা হয়ে যেতো এবং তখনই সেগুলো কুড়িয়ে এনে পুনরায় সামনে পেতে দিত।

ভারি জিনিসকে বহন করার এই নিয়মটা কিন্তু অনেকদিন ধরে চালু ছিল। খ্রীষ্টজন্মের প্রায় দু-হাজার বছর আগে পর্যন্তও মিশরীয়রা অনুরূপ পদ্ধতিতে ভারি পাথরের মূর্তি কিংবা পিরামিডের জন্য পাথর বহে বেড়াতো। তাদেরই হাতের আঁকা ছবি থেকে এই পদ্ধতির নমুনা পাওয়া গেছে অনেক।

তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছো, পিচ রাস্তার উপর দিয়ে বড় বড় তেলের পিপেকে

একজন মাত্র লোক দিব্যি গড়িয়ে গড়িয়ে নিয়ে যায়। স্থির অবস্থা থেকে পিপেকে কোনরকমে গড়িয়ে দিলে আর গড়াতে তত বেশী বল-প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না। এই সত্যটি আদিম মানুষ উপলব্ধি করেছিল আপন অভিজ্ঞতা থেকেই। আর যেদিন সে বুঝেছিল, মাটির ঘর্ষণকে উপেক্ষা করতে গোল জিনিসের কোন জুড়ি নেই। সেইদিনই চাকা তৈরি করতে প্রবৃত্ত হয়েছিল এবং সেই চাকাকে দিয়ে গাড়ী বানিয়েছিল। সে চাকা ছিল নিরেট কাঠের। কেবল মাঝখানটায় গোলাকার ছিদ্র করে অক্ষদণ্ডের গায়ে আলতোভাবে পরিয়ে দিয়েছিল। দু-পাশে এঁটে দিয়েছিল দুটি কীলক। অক্ষদণ্ডে টান পড়লে চাকা ঘুরতো কিন্তু ছিটকে বেরিয়ে যেতে পারতো না। ছেলেবেলায় মাটি দিয়ে অথবা গোল গোল কাঠের চাকতি দিয়ে এইভাবে হয়ত অনেকে তোমরা গাড়ী তৈরি করেছো।

এবার তোমাদের মনে প্রশ্ন আসবে, সেকালে পৃথিবীর সব জায়গার মানুষ কি একই সঙ্গে চাকা তৈরির ব্যাপারটা আয়ত্ত করে নিয়েছিল ; কিংবা সবাই একই সময়ে গাড়ী তৈরি করে ফেলেছিল ?

এর উত্তর কিন্তু সঠিকভাবে বলার কোন উপায় নেই। অতি প্রাচীনকালে কতকগুলো নদীর তীরভূমিতে বেশ কয়েকটি সভ্যতা বিকাশলাভ করেছিল। তাদের মধ্যে ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীর তীরে সুমেরীয় ও ব্যাবিলনীয় সভ্যতা, নীল নদীর তীরে মিশরীয় সভ্যতা এবং ভারতের সিন্ধুনদীর তীরে সিন্ধুসভ্যতা বিশেষভাবে উল্লেখ করার মত। এই সব সভ্যতার ধ্বংসাবশেষও আবিষ্কৃত হয়েছে। ধ্বংসাবশেষ থেকে পাওয়া গেছে বেশ কিছুসংখ্যক চাকা। কিন্তু দেখা গেছে, সবার চাকা একই ধরনের নয়। যেসব চাকা পাওয়া গেছে, কিংবা চাকা ও রথের ছবি পাওয়া গেছে, সেগুলিকে ভালকরে পরীক্ষা করেছেন বিশেষজ্ঞরা। যাঁরা প্রাচীনকালের জিনিসপত্র নিয়ে গবেষণা করেন তাঁরা বলেছেন, চাকা প্রথমে সুমেরীয়রাই তৈরি করেছিল এবং সেই চাকা দিয়ে তারা প্রথম রথও তৈরি করেছিল। সুমেরীয়দের পরে সিন্ধুতীরের অধিবাসীরা চাকা তৈরি করতে সমর্থ হলেও তারা সেই চাকাকে কুমোরের চাকরূপেই ব্যবহার করেছিল। কিন্তু চাকা দিয়ে রথ তৈরি করতে পারেনি। এদের পরে চাকার ব্যবহার হয়েছিল ক্রীটদ্বীপে এবং এশিয়ামাইনরে।

সেকালে মিশরীয় সভ্যতা ছিল অনেক-অনেক উন্নত। পণ্ডিতদের মতে ধাতুবিদ্যা, কারিগরিবিদ্যা ও গণিতে ওদের অবদানের যেন কোন তুলনাই হয় না। অথচ আশ্চর্য যে, তারা চাকার ব্যবহার জানতো না। খ্রীষ্টজন্মের মাত্র হাজার দেড়েক বছর আগে মিশরীয়রা চাকার ব্যবহার শুরু করেছিল। অবশেষে খ্রীষ্ট-

জন্মের ১২০০ অব্দের দিকে শুরু করে রথের ব্যবহার। কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, মিশরীয় সভ্যতা খ্রীষ্টজন্মের প্রায় তিনহাজার বছর আগে বিকাশলাভ করেছিল এবং সে সময়েও তারা ভাল ছবি আঁকতে পারতো। কিন্তু প্রাচীন ছবিগুলিতে একটিও চাকা কিংবা রথের ছবি পাওয়া যায়নি। যেসব চিত্রে চাকা ও রথ আছে—সেগুলো অনেক পরে আঁকা হয়েছিল।

চাকা দিয়ে প্রথম মানুষে টানা গাড়ী অথবা ঠেলা গাড়ীর মত গাড়ীর প্রচলন হয়েছিল কিনা তাও বলা যায় না। সে ধরনের কোন চিত্রও পাওয়া যায়নি। সবচেয়ে প্রাচীন যে চিত্রটি পাওয়া গেছে সেটি খ্রীষ্টজন্মের প্রায় সাড়ে তিনহাজার বছর আগে আঁকা সুমেরীয়দের একটি রথের ছবি। সে রথ ঘোড়ায় টানা রথ। তাতে আরোহণ করতেন কেবল রাজরাজড়ারা। ওর চাকাগুলো ছিল নিরেট কাঠের। সুমেরীয় সভ্যতার বিলোপকারী ব্যাবিলনীয়রা রথের আরও উন্নতি সাধন করেছিল এবং সে নিদর্শনও আবিষ্কৃত হয়েছে।

সুমেরীয় ও ব্যাবিলনীয়দের পরে রথ তৈরি করেছিল পশ্চিম এশিয়ার হিক্‌সস্‌ নামে অতি দুর্ধর্ষ এক জাতি। হিক্‌সস্‌রা আবার যুদ্ধে রথ ব্যবহার করতো এবং লোহার ব্যবহারও আয়ত্ত করেছিল। তাই খ্রীষ্টপূর্ব ১২০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে যুদ্ধরথ ও লোহার হাতিয়ার দিয়ে অল্পায়াসে মিশরকে জয় করে নিয়েছিল।

সেকালে ভারতবর্ষে যে আর্যদের আগমন হয়েছিল, তাঁরাও রথ ব্যবহারে পটু ছিলেন এবং এঁদের হাতিয়ারও ছিল লোহার। তাই তাঁরাও ঐ দুটির সাহায্যে এদেশের সুপ্রাচীন সভ্যতাকে ধ্বংস করে দিয়ে আপন অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সেও খ্রীষ্টজন্মের প্রায় দেড়হাজার বছর আগেকার ঘটনা।

আদিকালের ঘোড়ায় টানা রথ দু-চাকার এবং চার-চাকার উভয় ধরনেরই করা হতো। ধনীরা, রাজরাজড়ারা, পুরোহিতরা এবং সেনাপতিরা রথ ব্যবহার করতেন। দ্রুতগামী অশ্ব ছাড়া অন্য কোন প্রাণী সে রথ টানতো না। পরিবহনের কাজে সাহায্য করতো বলদ, উট ও হাতীরা। কিন্তু হাতী পোষার খরচ অনেক। সাধারণ মানুষ—যারা চাষবাস করতো, ব্যবসায়ীরা—যারা মালপত্র নিয়ে হাটে-বাজারে ঘুরতো, তারা দেখলো দুটো পশু যে ভার বহন করতে পারে তার চেয়ে অনেক বেশী পারে যদি পশুদুটোর দ্বারা গাড়ী টানানো যায়। অপরদিকে নিজেরও হাঁটার পরিশ্রম লাঘব হয়। সেই থেকে প্রতি দেশেই ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয় পশুতে টানা গাড়ী। গরুর গাড়ী, মহিষের গাড়ী, উটের গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী, এমনই কত ধরনের গাড়ী কালে কালে তৈরি হয়েছিল এবং

তাদের ব্যবহার এখনও অব্যাহত আছে গ্রামে-গঞ্জে—যেখানে পথঘাটের এখনও তেমন উন্নতি হয়নি, চাষবাসে যেখানে এখনও আদিম পদ্ধতিকে অনুসরণ করা হচ্ছে, জ্বালানী এবং বিদ্যুৎ যেখানে সহজলভ্য নয়, সেখানে পশুতে টানা গাড়ীর প্রচলন সেই পূর্বেরই মত থেকে গেছে।

মেঠো পথ থেকে রাজপথ এবং সেতু নির্মাণ

আদিতে পথ বলতে কোথাও কিছু ছিল না। থাকবেই বা কেমন করে? স্থায়ী-ঘর বাড়ীতো ছিল না মানুষের। যাযাবরের মত বনে বনে, পাহাড়ে পাহাড়ে, নদী ও হ্রদের তীরে তীরে ঘুরে বেড়াতো। মাটি কাটার তেমন ভাল কোন সরঞ্জাম ছিল না, এক দলের সঙ্গে অপর দলের কোন যোগাযোগ ছিল না, খাদ্য ও আত্মরক্ষা ছাড়া জীবনধারণের জন্য চাহিদাও বিশেষ ছিল না। তবে অত্যন্ত নির্ভীক ছিল তারা। খালি পায়ে, খালি গায়ে, বনবাদাড় ভেদ করে সারা পৃথিবীটাকেই যেন চষে ফেলেছিল।

খ্রীষ্টজন্মের তিন থেকে চার হাজার বছর আগে মানুষ যখন নদীর তীরভূমি-গুলিতে নগর সভ্যতার পত্তন করলো তখন তাদের চাহিদা বাড়তে থাকলো হু-হু করে। পাহাড় থেকে রাশি রাশি পাথর বহে আনতে হলো, বন থেকে গাদা গাদা কাঠ সংগ্রহ করতে হলো, চাষের জন্য হরেক রকমের সরঞ্জাম তৈরি করতে হলো, উৎপন্ন ফসলকে সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে হলো, এমনই আরও কত কি? যেন সেই মুনি এবং তাঁর কৌপিনের গল্পের মত অবস্থাটা দাঁড়ালো। তার উপর চাষবাসের ফলে হাতের কাছে প্রচুর খাদ্য মজুত থাকায় মানুষ বিলাসী হয়ে উঠলো। ফলে চাহিদা বেড়ে ওঠায় বিভিন্ন দেশের সঙ্গে স্থাপন করতে হলো যোগাযোগ। তারই পরোক্ষ ফল পথঘাটের উন্নতি।

প্রথম প্রথম মানুষের ধূলি-কাদা থেকে পা বাঁচাতে এবং পরিবহনের সুবিধা করতে মোটা মোটা কাঠের গুঁড়ি পেতে রাস্তা তৈরি করতো। তবে সে রাস্তা দীর্ঘ ছিল না। একটি জনপদের মধ্যে মাত্র কয়েকটি এই ধরনের রাস্তা থাকতো। দূরবর্তী জনপদ সমূহের সঙ্গে স্থলপথে সংযোগ রক্ষা করার দরকার না থাকায় রাজপথ ছিল না মোটেই। সেকালে জনপদগুলো আবার অতি সামান্য জায়গায় সীমাবদ্ধ ছিল এবং প্রকৃত জনপদ বলতে মাত্র দু-চার জায়গায় গড়ে উঠেছিল। মানুষের এত ভিড়ও ছিল না সেদিন। আর অধিকাংশ মানুষ আরণ্যক-জীবনে ছিল অভ্যস্ত।

প্রথম বাঁধাই রাস্তার পরিকল্পনা করেছিল মিশরীয়রা এবং সিন্ধুতীরে ভারতের অধিবাসীরা। তারা জমিতে সেচ দেওয়ার জন্য নদী পরিকল্পনা করেছিল। তার জন্য নদীর মুখে বাঁধ দিতে হয়েছিল, ছোট-বড় খাল খনন করতে হয়েছিল এবং মাঠে মাঠে আল দিতেও হয়েছিল। সেইগুলিই একসময় পথের রূপ নেয়।

মিশরীয়রা আরও এক ধরনের পথ তৈরি করেছিল। তারা পাহাড় থেকে পাথর এনে এবং পাথরকে মসৃণ করে পিরামিড বানাতো। ফলে পাহাড় পর্যন্ত এমন সুন্দর ও মজবুত রাস্তা তৈরি করতো—যা আজকের পাথরকুচি পাতানো পথের প্রায় অনুরূপ ছিল বলা চলে। আরও আশ্চর্য! তারা সেই আদিকালেও রাস্তায় বড় বড় পাথর বসাতো এবং দুই পাথরের মধ্যবর্তী গর্তকে ছোট-ছোট পাথরের টুকরো দিয়ে ভর্তি করে দিত। ঐ সময় সিন্ধু-উপত্যকায় মহেঞ্জোদড়োতে যে-সব রাস্তা তৈরি হয়েছিল সেগুলি ছিল পাকা ইটের। মহেঞ্জোদড়োর ধ্বংসাবশেষ থেকে যে পথের নমুনা পাওয়া গেছে, তা সত্যই বড় চমৎকার।

তারপর ধীরে ধীরে পৃথিবীর জনসংখ্যা বাড়তে থাকলো, অরণ্যে-কন্দরে যে-সব উপজাতি বাস করতো তাদেরও অনেকে রীতিমত সুসভ্য হয়ে উঠলো, ফলে জনপদের সংখ্যাও ক্রমশঃ বেড়ে চললো। যেহেতু প্রতিটি জনপদের এবং গোষ্ঠীর এক-একজন করে শাসক অথবা রাজা থাকতেন, বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করতে, প্রজাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে এবং প্রজাদের সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করতে প্রত্যেক রাজাই স্ব স্ব রাজ্যে কাঁচা রাস্তা তৈরি করতে বাধ্য হলেন। আর প্রাসাদসংলগ্ন রাস্তাগুলিকে তৈরি করলেন পাথর কিংবা ইট পাতিয়ে। মোট কথা, সেকালে অধিকাংশ পথ ছিল কাঁচা। ধরণীর ধূলি যাতে পদযুগলকে মলিন করতে না পারে তারজন্য রাজা এবং রাজপুরুষদের সবসময় যাতায়াতের পথগুলোই ছিল ইট কিংবা পাথরের।

প্রকৃত পাকা রাস্তা পরিকল্পনার মূলে আছে ইওরোপে রোমান আমলের অবদান। সার্থক পথ-নির্মাতার সম্মান একমাত্র রোমানদের প্রাপ্য বলে অনেকে মনে করে থাকেন। ওরা নাকি সর্বপ্রথম রাস্তা তৈরির কাজে বড় বড় পাথরের চাঁইর পরিবর্তে ছোট-ছোট পাথরকুচি ব্যবহার করতো। তারপর উপরে কাঁকর বিছিয়ে দিয়ে উঁচু-নিচুও ভাঙতো। এত চমৎকার পথ সে আমলে আর অন্য কোন দেশে ছিল না। কেবল তাই নয়, অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্তও এমন সুন্দর পথের পরিকল্পনা কোন দেশ করতে পারেনি।

পথঘাট ও যানবাহনের উন্নতির সূচনা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ থেকে ধরতে হবে। রাস্তা নির্মাণের আধুনিক পদ্ধতির প্রবর্তন করেন ইংলণ্ডের দুই প্রযুক্তিবিদ মেটকফে (১৭১৭-১৮১০) এবং টমাস টেলফোর্ড (১৭৫৭-১৮৩৪)।

মেটকফে ও টেলফোর্ডের পরে রাস্তার উন্নতির জন্য চিন্তাভাবনা করেছিলেন জন ম্যাক অ্যাডাম (১৭৫৬-১৮৩৬)। ইনি রাস্তার উপর ছোট ছোট পাথরের নুড়ি পাতিয়ে এবং উপরিভাগে বালির মত গুঁড়া পাথরকুচি চাপিয়ে এক নতুন

ধরনের অথচ ভারি চমৎকার রাস্তা তৈরি করেছিলেন। এত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সে রাস্তা ছিল যে, লোকে আবিষ্কারকের নামে রাস্তার নামকরণ করেছিল "ম্যাক অ্যাডামস্ রোড"।

উপরোক্ত রাস্তাগুলোর অসুবিধা যে আদৌ ছিল না—এমন নয়। রাস্তার উপরিভাগে মিহি পাথরের গুঁড়া চাপিয়ে যতই সমান করা হোক না কেন অল্প-দিনেই খারাপ হয়ে যেতো। ফলে গাড়ী ঘোড়ায় ঝাঁকুনি লাগতো, পায়ে হোঁচটও লাগতো। রাস্তাকে আরও সমতল এবং আরও ঝাঁকুনিমুক্ত ও দীর্ঘস্থায়ী করতে পাথরকুচির সঙ্গে পিচ মিশিয়ে ঢালা হতে থাকলো। তারপর রোলার চাপিয়ে উঁচু-নিচু ভাঙ্গা হলো। সেই থেকে পিচ রাস্তার হলো প্রবর্তন। তবে আগেকার প্রযুক্তিবিদদের পরিকল্পিত রাস্তাকে একেবারে বাতিলও করা হলো না। সিমেন্ট, বালি ও নুড়িপাথরকে একসঙ্গে মিশিয়ে পাথরকুচি পাতানো পথের উপর প্রলেপ দেওয়া হলো। ফলে রাস্তা হলো দীর্ঘস্থায়ী ও মজবুত। ঝাঁকুনি লাগাও বন্ধ হলো।

উপরোক্ত দুটি পদ্ধতিই এখনও অনুসৃত হচ্ছে। দু-ধরনের রাস্তার নামকরণ করা হয়েছে 'টার ম্যাক' ও 'কনক্রিট'। তবে আরও সত্য যে, পথঘাটের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হয়েছে ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে স্টীম রোলার আবিষ্কারের পর।

লেখাপড়ার সঙ্গে বইর সম্পর্ক যেমন নিবিড়, মানুষের সঙ্গে তার বাসস্থানের যেমন সম্পর্ক, ঠিক তেমনই রাস্তার সঙ্গে সম্পর্ক সেতুর। রাস্তাকে সোজাসুজি দূর দূর দেশের সঙ্গে যুক্ত করতে গেলে পথে কত নদী-খাল, খানা-খন্দ ইত্যাদিকে যুক্ত করতে হয়। পথের মাঝে যান থেকে নেমে যদি পায়ে হেঁটে জলকাদা ভেঙ্গে অথবা নৌকায় নদী-খাল অতিক্রম করতে হয় তাহলে গাড়ীচাপা এবং ভ্রমণের ষোলআনাই মাটি হয়ে যায়। অপরদিকে জলকাদা দেখলে মনও বিরক্তিতে ভরে উঠে। গাড়ী থেকে নাম-রে, জল কাদা ভেঙ্গে নৌকো ধর-রে, মাঝ নদীতে নৌকার টাল সামলাও-রে, পরপারে পুনরায় জলকাদা ভেঙ্গে ডাঙায় ওঠো-রে, পা ধোও-রে, গাড়ীর প্রতীক্ষা কর-রে, কত হরেক রকমের ঝক্কি ও ঝামেলা। তাই আগে প্রবচন ছিল "এক নদী ষোল ক্রোশ।" অর্থাৎ একটা নদী অতিক্রম করতে যে সময় লাগে তাতে ষোল ক্রোশ তথা বত্রিশ মাইল পথ পার হওয়া যায়।

আজকের মত সেই আগেকার দিনের মানুষের মনোভাবও একই ছিল। কিন্তু সেদিন কারও কিছু করার ছিল না। ছোট ছোট নদী কিংবা খালের উপরে বড়জোর একটা গাছের গুঁড়িকে ফেলে রাখতো অথবা কতকগুলি গুঁড়িকে ভেলার মত করে জলের উপর ভাসিয়ে রাখতো।

প্রকৃত সেতু মিশরীয়রাই প্রথম তৈরি করেছিল বলে মনে হয়। কথিত আছে, নীলনদের উভয় পারের সঙ্গে সংযোগ রক্ষার জন্য তারা অনেকগুলি সেতু নির্মাণ করেছিল। বলা বাহুল্য, সে সেতুগুলি ছিল কাঠের। নদীর বুকে দু'সারি কাঠের খুঁটি পুঁতে এবং আড়াআড়িভাবে দুদিকের দুটি খুঁটির মাথায় কড়ি ফেলে উপরের ভারসাম্য রক্ষার ব্যবস্থা করেছিল। এই খুঁটি এবং খুঁটির মাথায় কড়িকে ইংরাজীতে বলা হয়, "পাইল" ও "ট্রাস"। পণ্ডিতদের মতে, মিশরীয়রা পাইল ও ট্রাসের পরিকল্পনা করে সেতু নির্মাণের ক্ষেত্রে এক নতুন সম্ভাবনার দ্বার উদ্ঘাটন করেছিলেন, এবং এর গুরুত্ব এখনও হ্রাস পায়নি।

পাইল ও ট্রাসের আবিষ্কার অবশ্য খুবই পুরাতন। যে সময়ে মানুষ প্রথম হ্রদের বুকে এবং নদীর তীরে ঘর বাঁধতে শুরু করেছিল তখনই তারা আপন অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে পাইল ও ট্রাসের প্রবর্তন করেছিল। সেই পুরাতন ব্যবস্থাকেই প্রকৃতপক্ষে কাজে লাগিয়েছিল মিশরীয়রা।

সে আমলে আরও এক ধরনের সেতুর পরিকল্পনা করেছিল মানুষ এবং সেই সেতুর প্রচলন এখনও কোন কোন জায়গায় আছে। নাম রোপওয়ে বা দড়িপথ। নদীর উভয় পারে দুটি খুঁটি পুঁতে খুঁটি দুটিকে দড়ি দিয়ে সংযুক্ত করা হতো। উপরে ও নিচে এমন দুটি মোটা ও শক্ত দড়ি বাঁধা হতো, যাতে যে-কেউ উপরের দড়ি ধরে এবং নিচের দড়িতে পা রেখে পায়ে পায়ে হেঁটে যেতে পারতো।

সেকালে শক্তিশালী রাজারা আবার দিগ্বিজয়ে বার হতেন। তাঁদের সৈন্য-সামন্তদের নদী পারাপারের জন্য সাময়িকভাবে নদীর বুকে নৌকা ভাসিয়ে তৈরি করতেন সেতু। এখনও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে হয় নৌকা ভাসিয়ে নয়ত দু-মুখ বন্ধ ফাঁপা এবং ভয়ানক মোটা পাইপ ভাসিয়ে অস্থায়ী পুল তৈরি করা হয়। কুম্ভমেলার সময় প্রয়াগে গঙ্গা ও যমুনার উপর এই ধরনের অস্থায়ী সেতু অনেক-গুলি চোখে পড়ে।

স্থায়ী সেতু নির্মাণে মিশরীয়দের মত ব্যাবিলনীয়রাও কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিল। ওরা তৈরি করত কাঠের খিলান দেওয়া সেতু—যা মিশরের সেতু অপেক্ষাও ছিল উন্নত। তবে সে সময়ের কথা ভালভাবে জানা যায়নি এবং নমুনাও খুব বেশী পাওয়া যায়নি। অপরদিকে পাওয়া যায়নি কোন প্রযুক্তিবিদের নাম। সর্বাপেক্ষা প্রাচীন যে-সেতু নির্মাতার নাম পাওয়া গেছে, তিনি ছিলেন পারস্যের অধিবাসী। নাম ছিল মান্দ্রোক্লিস। কথিত আছে, পারস্যসম্রাট সাইরাসের আদেশে তিনি খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বসফরাস প্রণালীর উপর তিন হাজার ফুট দীর্ঘ একটি সেতু নির্মাণ করেছিলেন।

গ্রীক আমলে কারিগরিবিদ্যার অন্যান্য শাখার মত সেতু নির্মাণেও কিছুটা নতুনত্ব এসেছিল এবং পরবর্তী রোমান আমলে এর উন্নতি হয়েছিল অভাবনীয়-ভাবে। রোমানরা কাঠের সেতুর পরিবর্তে ইঁট কিংবা পাথরের খিলান দেওয়া সেতুর পরিকল্পনা করেছিল। সম্ভব হয়েছিল ওদের দ্বারা সিমেণ্ট জাতীয় পদার্থ আবিষ্কারের ফলে। ওরাই প্রথম নদীগর্ভ থেকে থাম গেঁথে সেতুকে দৃঢ় ও মজবুত করার চেষ্টা করেন। বিভিন্ন নমুনা থেকে জানা গেছে, সেতুর উপরিভাগে ওরা চৌকো চৌকো পাথর ব্যবহার করতো এবং পাথরগুলোকে লোহার আংটা দিয়ে দৃঢ়ভাবে আটকাবার ব্যবস্থা করতো। দুই পাথরের ফাঁকটা বন্ধ করতো সিমেণ্ট দিয়ে। অনেকটা আর্চের মত হতো সেইসব সেতু। ভারতীয়রাও উক্ত সময়ের বহু পূর্বে খিলান দেওয়ার ব্যবস্থা আয়ত্ত করেছিল। তারা বড় বড় মন্দিরের দেওয়ালের ভারসাম্য খিলানের উপর ন্যস্ত করতো কিন্তু খিলান দেওয়া সেতু তৈরি করতে পারতো কিনা জানা যায় না।

রোমান আমল থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় একই ধরনের সেতু নির্মাণ হয়ে আসছিল। যন্ত্রযুগ আরম্ভ হওয়ার পর সেতু নির্মাণ করতে গিয়েও শুরু হলো নতুনভাবে ভাবনাচিন্তা। সে-সময় লোহা, পাথর এবং পাথরকুচি, সিমেণ্ট ইত্যাদি যন্ত্রের কল্যাণে সহজলভ্য হয়েছে, একটা যন্ত্র শত শত মানুষের কাজ করছে, প্রযুক্তিবিদ্যারও হয়েছে দারুণ উন্নতি। আগের অপেক্ষা সেতুকে অনেক-অনেকবেশী ভারসহা করে গড়ে তোলার প্রয়োজন হয়ে পড়লো। ফলে সাবেক আমলের সেতুর চিন্তাধারাকে বাতিল করে নতুন চিন্তাধারার প্রবর্তন করতে হলো।

আধুনিক সেতু নির্মাণের ক্ষেত্রে যাঁর অবদান সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ তিনি সেই বিশিষ্ট পথ-নির্মাতা টমাস টেলফোর্ড। তিনি বেশ কয়েক ধরনের সেতুর ছক তৈরি করেছিলেন। সবগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করতে না পারলেও পরবর্তীকালে অন্যান্য প্রযুক্তিবিদ রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন এবং নিজ নিজ অভিজ্ঞতা ও চিন্তা-ধারাকেও যুক্ত করেন। ফলে সেতু নির্মাণের ক্ষেত্রেও যেন বিপ্লবের সূচনা হয়।

বর্তমানে সেতু যেন এক বিস্ময়কর বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে, কত রকমের না সেতু তৈরি হচ্ছে। মাইলের পর মাইল লম্বা প্রকাণ্ড রেলওয়ে সেতু, ভূগর্ভস্থ সেতু, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ফ্লাইওভার ইত্যাদিকে দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। আর এগুলির স্থায়িত্বও বড় কম নয়।

সেতু নির্মাণ প্রযুক্তিবিদ্যার এক অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অনেক মাপজোখ, অনেক অঙ্ক, অনেক চিত্র ও মডেলের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। বিজ্ঞানের অধিকাংশ

শাখার সঙ্গে ওর যোগ নিবিড়। অন্য কথায় বিজ্ঞানের বহু শাখার সমন্বয় ঘটেছে এখানে। যখন কোন গুরুত্বপূর্ণ সেতুর পরিকল্পনা করতে হয় তখন বহু প্রযুক্তিবিদকে দীর্ঘকাল ধরে মাথা ঘামাতে হয়। পরিশ্রমও বড় কম করতে হয় না। কেননা, এতটুকু খুঁত কোথাও থেকে গেলে বহুজনের জীবনহানি এবং এক বিরাট জাতীয় ক্ষতির সম্ভাবনা থেকে যায়।

পশুতে টানা গাড়ী থেকে কলের গাড়ী

চাকা থেকে ঘোড়ায় টানা রথ আসতে যেমন লেগেছিল কয়েক সহস্র বছর তেমনই রথ থেকে মালবহনের ও যাত্রীবহনের নিমিত্ত পশুতে টানা গাড়ী আসতেও লেগেছিল সহস্র বছরেরও অধিককাল। একরকম ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত চলে আসছিল সেই প্রাচীন ধারা। তবে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে পথঘাটের উন্নতি হলে পশুতে টানা গাড়ীরও কিছু উন্নতি হয়েছিল। অসমতল পথে গরুর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী, উটের গাড়ী, কোন গাড়ীই আরোহীকে স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম দিতে পারতো না বলে যাত্রীবহনের জন্য কোন নির্দিষ্ট গাড়ীর উদ্ভব এ পর্যন্তও হতে পারেনি। একই গাড়ী মালপত্র ও যাত্রী উভয়কে বহন করতো। পরিশেষে পথঘাটের উন্নতি হলে যাত্রীবহনের জন্য সুদৃশ্য ঘোড়ার গাড়ীর প্রথম প্রচলন হয় ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে। বর্তমানে যাত্রীবাহী বাসের মত এরাও নির্দিষ্ট পথে এবং নির্দিষ্ট সময়ে যাতায়াত করতো, আর রাস্তায় যাত্রীদের ওঠানো ও নামানোর ব্যবস্থা করতো।

সেইসময় গাড়ীর ঝাঁকুনি কমাতে একধরনের লাইনও পাতা হয়েছিল। আজকের রেললাইনের মত ছিল সে লাইন। তবে লোহার পাতের পরিবর্তে কাঠের লাইন পাতা হতো। গাড়ীর চাকা তৈরি করা হতো রেলগাড়ীর চাকার মত মাঝখানে খাঁজকাটা। কাঠের সেই লাইনের নামকরণ করা হয়েছিল ট্রাম। যেহেতু ঐ ট্রামের উপর দিয়ে বিশেষ চাকাওয়ালা ঘোড়ার গাড়ী ছুটতো, তাই তেমন ঘোড়ার গাড়ীকে বলা হত ট্রামগাড়ী। এখনও ট্রামগাড়ী চলে। তবে কাঠের পরিবর্তে পাতা হয় লোহার লাইন এবং ঘোড়ার পরিবর্তে ব্যবহার করা হয় বিদ্যুৎকে। অথচ নামটা সেই একই থেকে গেছে। এই ধরনের ট্রামগাড়ী কলিকাতায়ও বেশ কিছুকাল ধরে চলেছিল।

ইংলণ্ডে যেসব রাস্তায় ট্রাম পাতা ছিল না অথচ রাস্তা ছিল সমতল সেইসব রাস্তায় চলতো ঘোড়ায় টানা বাস এবং এর চাকা ছিল সাধারণ চাকা।

ক্রিং ক্রিং সাইকেল—পশুতে টানা গাড়ীকে বাদ দিলে, নিজের খেয়ালে গাড়ী চালাবার পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে প্রথম যে গাড়ী আত্মপ্রকাশ করেছিল—সেটি সাইকেল।

সাইকেলের সঙ্গে তোমাদের সবার আছে পরিচয়। সাইকেলে চাপতেও

জান অনেকে। ক্রিং ক্রিং বেলের শব্দ ছাড়তে ছাড়তে যখন এগিয়ে যাও তখন ভাব, কি মজা! কি মজা! আবার যেদিন প্রথম সাইকেলে চেপেছিলে সেদিনের মজাটা আরও ছিল বেশী। কিন্তু যে ভদ্রলোক প্রথম সাইকেল নিজ হাতে তৈরি করে নিজেই চেপেছিলেন, তিনি কত মজা লুটেছিলেন? সত্যি, তিনি নিজে কেবল মজা পাননি, অপরকেও তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন।

প্রথমে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, কোন কিছু জন্মমুহূর্তে তার আসল রূপটা লাভ করতে সমর্থ হয় না। অনেক ত্রুটি, অনেক গলদ, অনেক অসুবিধা থেকে যায়। দীর্ঘকালের ব্যবধানে বহুজনের বহু চিন্তাধারা যুক্ত হলে তবেই হয়ে উঠে সর্বাঙ্গসুন্দর। যেমন ছোট শিশু পরিচর্যার মাধ্যমে বড় হয়ে একদিন দশজনের একজন হয়।

সাইকেলও তার ব্যতিক্রম নয়। প্রথম সাইকেল নির্মাতার সাইকেলের সঙ্গে আজকের সাইকেলের আকাশ-পাতাল তফাৎ। সেদিনের সেই সাইকেলের ব্রেক ছিল না, বেল ছিল না, প্যাডেলও ছিল না। কাঠের একটা হাতল অবশ্য ছিল। আর ছিল একটা ডাণ্ডার উপর ন্যাকড়ার ফালি জড়ানো আসন বা সিট।

নিশ্চয়ই ভাবছো, সে সাইকেল চলতো কেমন করে? কেমন করে গড়াতো চাকা? সে এক মজার কাণ্ড। আরোহী সিটের উপর বসে পা ঝুলিয়ে দিতেন মাটিতে, আর উবু হয়ে মাটিতে পা চেপে লাগাতেন এক ঠেলা। অমনি পা-দুটো গুটিয়ে নিতেন আর সাইকেলটা গড় গড় করে কিছুটা এগিয়ে যেতো। এর আবিষ্কর্তা হিসেবে ব্যারণ ভন ড্রাইস নামে এক ভদ্রলোকের নাম করা হয়।

অনুরূপ সাইকেল প্রথম প্রচলন হয়েছিল ফ্রান্সে। একে আর একটু উন্নত রূপ দেন ন্যাভারসন নামে ফ্রান্সের আর এক ভদ্রলোক। তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে সাইকেলে একটা ভাল হাতল এবং একটা ভাল সিট চাপিয়েছিলেন। বসতে একটু আরাম হলো বটে, তবে প্যাডেল না থাকায় সেই পা দিয়ে ঠেলে ঠেলে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। তবুও সেই সাইকেল বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল এবং অনেকেই এই ধরনের সাইকেল তৈরি করেছিল। সেদিনের সেই সাইকেলের নাম রাখা হয়েছিল 'ডাণ্ডি হর্স'। বাংলায় বাবুঘোড়া। ভারি চমৎকার নাম, তাই না?

বাবুঘোড়ার প্রচলন ছিল অনেকদিন। আবার ফ্রান্সের দেখাদেখি পাশাপাশি অনেক দেশও বাবুঘোড়া তৈরি করতে শুরু করে। এতে গতিও তেমন ছিল না, আরাম বোধও বড় একটা হতো না। গতির আনন্দ আনতে এবং কিছুটা আরাম বোধ করতে স্কটল্যাণ্ডের ম্যাকমিলান সাহেব বুদ্ধি খরচ করে একদিন সাইকেলে

প্যাডেল যুক্ত করলেন। তখনই কিছুটা আধুনিক রূপ লাভ করে সাইকেল। আর ম্যাকমিলান সাহেবও প্যাডেলযুক্ত সাইকেল বিক্রি করে বেশ দু-পয়সা কামিয়েছিলেন।

ম্যাকমিলান সাহেবের পর অনেকে সাইকেলের চাকা দুটিকে নিয়ে নানাভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন। গতি বাড়ানোর জন্যে কেউ সামনে বড় চাকা ও পেছনে ছোট চাকা যুক্ত করলেন, কেউ আবার পেছনের চাকাকে নিতান্ত ছোট করে সুবিধা পেতে চাইলেন। কিন্তু দেখা গেল, সাইকেলের দুটি চাকা সমান হলেই সুবিধাটা যেন বেশী পাওয়া যায়।

ম্যাকমিলান সাহেবের প্যাডেল সামনের চাকায় পরানো হতো। প্যাডেলের সঙ্গে চেনের কোন সম্পর্ক ছিল না। তখনকার প্যাডেল ছিল আজকের ছোটদের তিনচাকার খেলনা গাড়ীর মত। চেন দিয়ে পেছনের চাকা থেকে সামনের চাকার প্যাডেল ঘোরানোর পদ্ধতি আবিষ্কার করেন ভ্যানডেল সাহেব। তিনি হাতলেরও উন্নতি সাধন করেন এবং প্রথম ব্রেকেরও ব্যবস্থা করেন। প্রকৃত-পক্ষে এতদিনেই সাইকেল লাভ করে তার নিজস্বরূপটি।

আরও মজার কথা, ভ্যানডেল সাহেবের হাতে সাইকেল নতুন রূপ লাভ করলো বটে, কিন্তু সে সাইকেলের চাকার তলায় টায়ার ও টিউব ছিল না। ফলে মাটিতে ঘস ঘস করে বিশ্রী আওয়াজ ছড়াতে ছড়াতে সাইকেল চলতো। আরোহীর তাতে পরিশ্রম বেশ হতো এবং গতিবেগও তেমন ছিল না। চাকার তলায় টায়ার-টিউব পরিয়ে সাইকেলের গতিবেগ বাড়ানোর কৃতিত্ব ডানলপ সাহেবের। প্রথম প্রথম চাকার তলায় রবারের টিউব আচ্ছা করে বেঁধে দেওয়া হতো। বায়ুভরা টিউব এবং টিউবকে ঘিরে টায়ার পরানো আরও পরের ঘটনা।

কোথায় সেই বাবুঘোড়া, আর কোথায় আজকের এই সাইকেল! অদ্ভুত রূপান্তর—তাই না?

ঝিক্ ঝিক্ রেলের গাড়ী—দেখেছো তোমরা, দুটি সমান্তরাল লোহার লাইনের উপর দিয়ে ঝিক্ ঝিক্ শব্দে এগিয়ে যায় রেলের গাড়ী। যেদিন প্রথম রেলপথ দেখেছিলে, সেদিন নিশ্চয়ই ছোট অপুর মত তোমাদের মনেও প্রশ্ন এসেছিল—দুটি লোহার লাইন বরাবর পাতা কেন? কেন গাড়ী মাটির উপর দিয়ে না গিয়ে পাতের উপর দিয়ে যায়? সরু পাতের উপর দিয়ে এত বড় গাড়ীটা যেতে যেতে কেন ছিটকে পড়েনা?

সত্যি, রেলগাড়ীর যত কারিগরি সব ঐ পাতকে ঘিরে। প্রতিটি চাকায়

ঐ পাতের মাপের খাঁজ আছে। যার ফলে চাকাটার খাঁজের ভেতরে পাতাটা ঢুকে পড়ে।

আর ঐ যে বরাবর দুটি লাইন পাতা থাকে—এটি গাড়ীর ঝাঁকুনি কমানো এবং গতিবেগ বাড়ানোর জন্য। এই লাইন পাতার ব্যাপারটা অবশ্য আজকের পরিকল্পনা নয়। একরকম ষোড়শ শতাব্দীতে এই ধরনের লাইনের প্রচলন হয়েছিল। সে-সময় যন্ত্রচালিত কোন গাড়ী ছিল না এবং পাতগুলোও লোহার ছিলা না? কাঠের গুঁড়ির উপর কাঠের লাইন পাতা হতো। তবে সবদেশেও এমন লাইন ছিল না। কেবল মধ্য ইওরোপের দু-চারটি জায়গায় এমন দু-চারটি লাইন ছিল।

পুরানো সেই কাঠের উপর কাঠের লাইন পাতার কাজ ব্যাপকভাবে শুরু হয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংলণ্ডে। সে-সময় ইংলণ্ডে খনি থেকে উত্তোলন করা হতো প্রচুর কয়লা। খনি থেকে শহরে ও বন্দরে এমন লাইনের উপর দিয়ে ঠেলাগাড়ীতে করে কয়লা চালান দেওয়া বেশ সহজ হতো। তাই ইংলণ্ডের দেখাদেখি অন্যান্য দেশ, এমনকি সুদূর উত্তর আমেরিকায়ও পাতা হয়েছিল কাঠের লাইন। লোহার লাইন পাতার পরিকল্পনা করেছিলেন বেঞ্জামিন আউটরাম নামক একজন প্রযুক্তিবিদ্। তখন যন্ত্রযুগ শুরু হয়ে গেছে। পর্যাপ্ত কয়লা উত্তোলিত হচ্ছে, লোহা-নিষ্কাশনের সুষ্ঠু উপায় উদ্ভাবিত হয়েছে এবং নানা ধরনের যন্ত্রপাতিও তৈরি হচ্ছে। লোহা সহজলভ্য হওয়ায় লাইনকে দীর্ঘস্থায়ী ও মজবুত করার জন্য আউটরাম এবং তাঁর ব্যবসায়ের অংশীদার উইলিয়ম জোসেফ এক অভিনব উপায় উদ্ভাবন করলেন। পূর্বের মত পাথর কুচি পাতানো রাস্তায় মোটা মোটা কাঠের গুঁড়ি পেতে গুঁড়ির উপর লোহার পাতাকে দৃঢ়ভাবে আটকাবার ব্যবস্থা করলেন। লাইন যেমন মজবুত হলো তেমনই হলো ঝকঝকে ও সুন্দর। হঠাৎ ক্ষয় হওয়া, মচকে যাওয়া বা ফেটে যাওয়ার ভয় আর থাকলো না। খরচ একটু বেশী পড়লেও লাইনের মত লাইন হলো। মজবুত ঐ লাইনের উপর দিয়ে তখন কেবলমাত্র ঠেলাগাড়ী চললো না, ঘোড়ায় টানা যাত্রীবাহী গাড়ীরও যেতে সুবিধা হলো।

এদিকে শুভক্ষণে একদিন পাশ্চাত্যের প্রযুক্তিবিদদের কাছে উদ্ঘাটিত হলো বাষ্পের রহস্য। জলকে বাষ্পীভূত করে সেই বাষ্পকে আটকে রাখলে সে যে প্রচণ্ডভাবে চাপ প্রয়োগ করে এবং সেই চাপকে কাজে লাগালে যে অসাধ্যকে সাধন করা যায়—এই সত্য প্রকাশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অনেকে সচেষ্ট হয়েছিলেন বাষ্পশক্তির সাহায্যে ইঞ্জিন চালাতে। একদিন নিউকোমেন নামে এক প্রযুক্তি-বিদ সমর্থও হলেন বাষ্পচালিত ইঞ্জিন তৈরি করতে। কিন্তু নিউকোমেনের

ইঞ্জিনের যথেষ্ট অসুবিধা থাকায় জনপ্রিয় হতে পারলো না। অবশেষে আর এক প্রযুক্তিবিদ জেমস ওয়াট ঐ নিউকোমেনের ইঞ্জিনেরই উন্নত রূপ প্রদান করায় এবং অত্যন্ত কার্যকরী হওয়ায় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে শুরু হলো ইঞ্জিনের যুগ।

প্রথম প্রথম ইঞ্জিনের সাহায্যে খনি থেকে জল তোলা হতো এবং শস্য ভাঙ্গা হতো। কিন্তু ইঞ্জিনের কর্মক্ষমতা দেখে কারও কারও মাথায় এলো, পশুশক্তির পরিবর্তে বাষ্পশক্তিতে কাজে লাগিয়ে গাড়ীকেও টানা যেতে পারে।

পুরোদমে চিন্তাভাবনা শুরু হয়ে গেল এবার। শেষপর্যন্ত ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে নিকোলাস কুনো নামে ফ্রান্সের এক প্রযুক্তিবিদ সত্যসত্যই একদিন তৈরি করলেন তিনচাকার একটি গাড়ী। বয়লারে জলকে বাষ্পীভূত করে যে বাষ্প লাভ করলেন, সেই বাষ্পের সাহায্যে গাড়ীর চাকাকে ঘোরাতে সমর্থ হলেন। দুঃখের বিষয়, কুনোর গাড়ীটি একরকম জন্মলগ্নেই হারিয়ে গেল। বড় দুঃখের সে কাহিনী।

কুনোর গাড়ীটি ছিল ছোট। চালক সমেত মাত্র তিনজনের স্থান হয়েছিল তাতে। গাড়ীটি প্রথম চালাতে গিয়েই প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেল সামনের একটি দেওয়ালের গায়ে। বয়লার গেল ফেটে। যাত্রীরা ছিটকে পড়লেন এবং বেচার কুনোও জোর আঘাত পেলেন।

কুনোর সর্বনাশা বু্দ্ধি দেখে শঙ্কিত হলেন জনসাধারণ থেকে সরকার পর্যন্ত সবাই। কুনোর স্থান হলো হাজতে। আর ফ্রান্সের সরকার গাড়ীটিকে শুধু বাজেয়াপ্ত করলেন না, দেশে যাতে কেউ গাড়ী তৈরি করতে না পারে তার জন্যও ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন।

কুনোর পর গাড়ী তৈরি করেছিলেন ইংলণ্ডের উইলিয়ম মার্ডক। প্রকৃতপক্ষে ঐ মার্ডকের গাড়ীকেই রেলইঞ্জিনের আদি অবস্থা বলে ধরা যেতে পারে। কিন্তু গাড়ী চালাতে গিয়ে মার্ডকও বিশেষ সুবিধা করতে পারলেন না। গাড়ীর বিশ্রী ঘড় ঘড় আওয়াজ, প্রচণ্ড ধোঁয়া এবং বিকট চেহারা অনেকেরই অস্বস্তির কারণ হয়েছিল। ফলে কুনোর মত মার্ডকও দ্বিতীয়বার গাড়ীকে রাস্তায় বার করতে পারলেন না।

এত বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও কিছু কিছু মানুষের মন থেকে গাড়ীর কথা মু ছ যেতে পারলো না। তার কারণ সৃষ্টির আনন্দ যিনি পেতে চান, নতুন কিছু করার জন্য যিনি মেতে উঠেন, তাঁর কাছে শত শত বাধা বিপদও হার মানতে বাধ্য হয়। এমনকি জীবনেরও পরোয়া করেন না তাঁরা। মনের খেয়ালকে চরিতার্থ করতে

আপন মনেই তাঁরা কাজ করে যান এবং বাহিরে কোথায় কি ঘটছে না ঘটছে সে বিষয়ে খোঁজখবর রাখারও প্রয়োজন অনুভব করেন না। বা পরে কি ঘটবে সে বিষয়েও আদৌ চিন্তা করেন না। তাইতো মানবসমাজ লাভ করেছে কত সুমহান আবিষ্কারকে। যদি কুনো ও মার্ডকের পরিণতি দেখে সবাই ভীত হয়ে গাড়ী তৈরি বন্ধ করে দিতেন তাহলে পশুতে টানা গাড়ীর দিন কখনও ফুরাতো না।

বাধা আছে, বিপদ আছে, এমনকি মরণেরও ভয় আছে, তবু মার্ডকের পরেও খেয়ালি মনের ফসল হিসাবে তৈরি হলো গাড়ী। তৈরি করলেন ইংলণ্ডের অপর এক প্রযুক্তিবিদ—রিচার্ড ট্রেভিথিক। পূর্বের ঘটনাগুলি থেকে অভিজ্ঞতালাভ করায় ট্রেভিথিক গাড়ীকে যাত্রীবহনের জন্য ব্যবহার করলেন না। দু-দুটি নতুন ধরনের ইঞ্জিন তৈরি করে খনি এলাকায় কয়লা পরিবহণের কাজে নিয়োগ করলেন।

দিন যায়। একদিন কয়লা পরিবহণের জন্য ইংলণ্ডের ম্যাঞ্চেস্টার থেকে লিভারপুল পর্যন্ত লোহার রেললাইন পাতা হলো। কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা ছিল ঠেলা-গাড়ীতে করে কয়লাকে বহে নিয়ে যাবে। কিন্তু স্টিফেনসন নামে এক প্রযুক্তিবিদ লাইন দেখে অনুরোধ জানালেন, তিনি ইঞ্জিনের সাহায্যে একা বহু ঠেলাগাড়ীর কয়লা একসঙ্গে এবং অতি অল্প সময়ে বহে নিয়ে যেতে পারবেন—যদি তাঁকে অনুমতি দেওয়া হয়।

কর্তৃপক্ষ সহজে স্বীকৃত হলেন এবং স্টিফেনসনকে ইঞ্জিন তৈরির নির্দেশ দিলেন। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে স্টিফেনসান নামালেন তাঁর ইঞ্জিনকে। সেই ইঞ্জিনটির নাম ছিল রকেট। শ' শ' কুইন্ট্যাল কয়লা বোঝাই নিয়ে রকেট অল্প সময়ের মধ্যে পৌঁছে গেল গন্তব্য স্থলে। বিস্মিত হলো সবাই এবং পরিবহণের ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূচনা হলো।

স্টিফেনসনকেও সেদিন বহু সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিন্তু কোম্পানীর পৃষ্ঠপোষকতায় সব সমালোচনা একদিন ভেস্তে গেল। দেখতে দেখতে অদ্ভুত জনপ্রিয়তা অর্জন করলো স্টিফেনসনের ইঞ্জিন এবং এর ব্যবহার দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়লো।

এবার রেল ইঞ্জিনকে নিয়ে বহুদেশে শুরু হলো গবেষণা। ফলে আরও উন্নত রূপ প্রাপ্ত হলো রেল ইঞ্জিন। একদিন কাঠকে পুড়িয়ে যেখানে ইঞ্জিন চালানো হতো, সেখানে ব্যবহার করা হলো কয়লা এবং ইঞ্জিনও তৈরি হলো কয়লা দহনের উপযোগী করে।

এখনও কয়লার ইঞ্জিন চলে। তবে ডিজেলের উপযোগী ইঞ্জিনের ব্যবহার ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। তাছাড়া যেখানে বিদ্যুতের স্থবিধা আছে সেখানে বিদ্যুৎকে কাজে লাগিয়ে চালানো হচ্ছে রেলগাড়ীকে। এখন আবার কোন কোন দেশ রেলইঞ্জিন চালাতে প্রাকৃতিক গ্যাসকেও ব্যবহার করছে।

ভোঁ ভোঁ মোটর গাড়ী—রেলগাড়ীর পরেই মোটর গাড়ীর প্রচলন শুরু হয়। যদিও রেলগাড়ী এবং মোটরগাড়ী উভয়েরই পূর্বপুরুষ নিকোলাস কুনোর সেই তিনচাকার গাড়ী। কিন্তু বহু বাধা-বিপত্তির ভেতর দিয়ে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকৃত রেলগাড়ী আত্মপ্রকাশ করলেও মোটগাড়ী তৈরির দিকে এযাবৎ কেউ বড় একটা নজর দেয়নি। কেবল ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ বৃটেনে ঘোড়ায়টানা যে যাত্রীবাহী গাড়ীর প্রচলন ছিল সেই গাড়ীতে ঘোড়ার পরিবর্তে বাষ্পচালিত ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়েছিল। সেটির নাম ছিল স্টীম ক্যারেজ। গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় মাত্র চার মাইলের মত। যদিও সরকার থেকে নিয়ম করে দেওয়া হয়েছিল, অনুরূপ গতিবেগের বেশী গতিবেগে কোন গাড়ীকে চালানো চলবে না।

দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত ছিল ঐ স্টীম ক্যারেজই। যাত্রীবাহী রেলগাড়ীর প্রচলন হওয়ায় এবার অনেকে এগিয়ে এলেন স্টীম ক্যারেজের উন্নতিসাধন করতে। এ বিষয়ে মনে হয় সর্বাধিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন জার্মানীর নিকলাউস অটো। তিনি কুনোর মতই তিনচাকার গাড়ী তৈরি করেছিলেন এবং চালিয়ে ছিলেন স্টীম ইঞ্জিনের সাহায্যে।

অটোসাহেবকে সৌভাগ্যবান বলতে হবে। কারণ, তাঁর গাড়ী কোন দুর্ঘটনায় পতিত হয়নি। বরং গাড়ীটির বৈশিষ্ট্য অনেককে মুগ্ধ করেছিল। যাঁরা বিত্তবান, তাঁরা নিজে অথবা পরিবারের লোকজনকে নিয়ে হাওয়া খেতে এবং হাঁটার কষ্টকে উপেক্ষা করতে সেই অটোসাহেবের গাড়ীকে কিনতে উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন। ফলে হু হু করে বিক্রি হয়েছিল সেই গাড়ী। আর অটোসাহেবের হাতেও জলের মত টাকা এসেছিল।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ছাদবিহীন অটোসাহেবের গাড়ীই চলে আসছিল। সে সময় পর্যন্তও চাকার তলায় টায়ার টিউব পরানোর ব্যবস্থা ছিল না। ডানলপ সাহেব সাইকেলের তলায় টায়ার টিউব ব্যবহার করার পরেই গাড়ীর চাকায়ও পরানো হলো সেই টায়ার ও টিউব।

এ পর্যন্ত যত গাড়ী তৈরি হয়েছিল তাকে ঠিক মোটরগাড়ী বলা চলে না। প্রকৃত মোটরগাড়ী তৈরি হয়েছে পেট্রোল ইঞ্জিন আবিষ্কারের পরে। পেট্রোল

ইঞ্জিন হালকা ও ছোট। কার্যকরী ক্ষমতাও বেশী। তাই গাড়ীতে পেট্রোল ইঞ্জিন ব্যবহার করতে অনেকেই সচেষ্ট হয়েছিলেন। শেষে কার্লবেঞ্জ এবং গটলিয়ের ডেমলার নামক জার্মানীর দুজন প্রযুক্তিবিদই কৃতকার্য হন।

পেট্রোল ইঞ্জিন ব্যবহারের পর গাড়ীর গতিবেগকে আর চার মাইলের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব হয়নি। এবার অনেক গতিবেগ লাভ করলো সে। গতির যুগ যেন আরম্ভ হয়ে গেল। বাধ্য হয়ে সরকার পূর্বের নিয়মকে শিথিল করলেন।

বেঞ্জ ও ডেমলার সাহেব ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দেই তাঁদের মোটরগাড়ীকে বাজারে ছেড়েছিলেন। তখনও মোটরগাড়ীর ছাদ ছিল না; তবে গাড়ী তিনচাকার বদলে চারচাকার ছিল। সামনে থাকতো ইঞ্জিন এবং পেছনের আসনে বড়-জোর চারজন স্থান পেতো। কিন্তু গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় পঁচিশ থেকে চল্লিশ মাইল।

বেঞ্জ ও ডেমলার সাহেবের ছাদবিহীন গাড়ী যাত্রী বহন অপেক্ষা ব্যক্তিগত ভাবে ব্যবহার্য গাড়ী হিসাবে অধিক প্রচলন ছিল। প্রায় একই সময়ে অথবা কিছু পূর্বে তথা ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সাইকেলেও পেট্রোল ইঞ্জিন যুক্ত করে মোটর সাইকেলের ব্যবস্থা হয়েছিল এবং এটিও ব্যবহৃত হয়েছিল ব্যক্তিগত গাড়ী হিসাবে।

যাত্রীবাহী মোটরবাস প্রথম তৈরি করেন আমেরিকার হেনরি ফোর্ড। এক দরিদ্রের সন্তান ছিলেন তিনি। তথাপি আপন কর্মকুশলতায় একদিন শ্রেষ্ঠ এক প্রযুক্তিবিদরূপে সম্মানিত হয়েছিলেন। তিনিই প্রথম সচেষ্ট হয়েছিলেন অধিক সংখ্যক যাত্রী বহনের নিমিত্ত প্রকৃত 'বাস' তৈরি করতে। তাছাড়া ট্যাক্সি ও মালবহনের নিমিত্ত লরী তাঁরই পরিকল্পনার ফসল।

বাস কথাটি এসেছে 'অমনিবাস' কথাটি থেকে। অমনিবাসের অর্থ "আমি বহন করি"।

হেনরি ফোর্ডের গাড়ীতেই প্রথম ছাদের ব্যবস্থা হয়। উক্ত কারণে তাঁরই গাড়ী জনপ্রিয়তার শীর্ষে আরোহণ করেছিল।

ডিজেল ইঞ্জিন আবিষ্কৃত হওয়ার পর মোটর গাড়ীতেও ঐ ইঞ্জিন ব্যবহার হতে শুরু করে। বর্তমানে অধিকাংশ বাস ও লরীতে ডিজেল ইঞ্জিন যুক্ত করা হয়। আজকের জ্বালানীর সঙ্কটের দিনে আবার সৌরশক্তির সাহায্যে বাস এবং লরীকে চালানোর ব্যবস্থা চলছে। কোন কোন দেশ সক্ষমও হয়েছে। হয়ত ভবিষ্যতে ঐ সৌরশক্তিই হবে প্রধান হাতিয়ার।

মাটি ছেড়ে আকাশে

মানবসভ্যতা বিকাশের আদিপর্বে মানুষ যেদিন আশেপাশের বস্তুসমূহকে নিয়ে ভাবতে শুরু করেছিল, সেইদিনই আকাশের নীলিমা তার মনকে হরণ করেছিল। পাখীর দিকে তাকাতে তাকাতে মনে হয়েছিল, "হায়রে হায়! যদি পাখীর মত আমারও একজোড়া সুন্দর ডানা থাকতো তাহলে আমিও নীলাকাশে গা ভাসিয়ে দিয়ে যেখানে খুশি সেখানে যেতে পারতাম।"

মানুষ ঐখানে থেমে যায়নি। আপন কল্পনাকে রূপ দিয়েছিল সাহিত্যে। প্রায় সব দেশের অধিকাংশ প্রাচীন সাহিত্যে আকাশে বিচরণকারী দেবতা, পরী, পক্ষিরাজ ইত্যাদির কাহিনী আছে। ইওরোপের লোকসাহিত্যগুলিতে পিগসাসের নাম পাওয়া যায়। ঐ পিগসাস আমাদের দেশের লোকসাহিত্যে পক্ষিরাজ ঘোড়া ছাড়া কিছুই নয়। কোন কোন লোকসাহিত্যে আরও দেখা যায়, স্বর্গ থেকে যাঁরা দেবতার নির্দেশ বহন করে পৃথিবীতে আসতেন তাঁদের পাখীর মত ডানা ছিল। 'মারকারি' ছিলেন এই ধরনের ডানাধারী এক বিশিষ্ট দেবতা।

গ্রীকপুরাণে ডিডেলাস ও আইকেরাসের গল্প আছে। এঁরা পাখীর পালককে মোম দিয়ে জুড়ে জুড়ে নকল ডানা তৈরি করেছিলেন এবং সেই ডানাজোড়া হাতে বেঁধে দিব্যি আকাশমার্গে উড়ে যেতেন।

পৌরাণিক কাহিনীগুলি সত্য কিনা সে বিষয়ে কিছু বলার উপায় নেই। তবে পাখীর পালককে জুড়ে কৃত্রিম ডানা নির্মাণ এবং সেই ডানার সাহায্যে ওড়ার প্রয়াস প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছিল বলে মনে হয়। কারণ, মধ্যযুগে ইওরোপীয় সাহিত্যে পাখীমানুষের কথা পাওয়া যায়। ওঁরা নাকি হাতে ও পায়ে কৃত্রিম ডানা জুড়ে লাফ দিয়ে দিয়ে অতি অল্প সময়ে বহুদূরে এগিয়ে যেতে পারতেন। কেউ কেউ ঘরের ছাদে এবং পাহাড়ের গায়েও যে ধাক্কা খেয়েছিলেন এমন কাহিনীও লাভ করা যায়।

যাইহোক, পাখীর মত ডানা জুড়ে আকাশে ওড়ার নিখুঁতভাবে পরিকল্পনা করেছিলেন পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রখ্যাত ইতালীয় চিত্রকর ও প্রযুক্তিবিদ লিওনার্দো দা ভিঞ্চি। তিনি নিজে অবশ্য আকাশে ওড়ার চেষ্টা করেননি, তবে কতকগুলি ছবি এঁকেছিলেন। তাঁর সেই পরিকল্পনা পরের দিকে অনেককে উৎসাহিত করেছিল এবং কৃত্রিম ডানা জুড়ে অনেকে উড়েও ছিলেন। কিন্তু সফলকাম কেউ হতে পারেননি। কেউ সামান্য কয়েক ফুট উঁচুতে উঠেছিলেন, কেউ উড়তে গিয়ে

হাত-পা-ভেঙ্গে পঙ্গু হয়েছিলেন, কেউবা মৃত্যুকেও বরণ করেছিলেন। ১৮৯৬ সালের ৯ই আগস্ট অটো লিলিয়েন্থালের মৃত্যু-বিমান নির্মাণের ইতিহাসে এক অতীব বেদনাদায়ক ঘটনা।

সেদিন পাখীর মত ডানা জুড়ে আকাশে ওড়ার পরিকল্পনার মূলে ত্রুটি যথেষ্ট ছিল। পাখীদের শরীর হালকা, হাড় তাদের ফাঁপা এবং ফাঁপা অংশের মধ্যে বায়ু থাকে। তাই তারা ডানা মেলে অক্লেশে আকাশে গা-ভাসিয়ে দিতে পারে। কিন্তু মানুষের শরীরের গঠন তো তেমনটি নয়। ঐ কারণেই ডানা যাঁরাই জুড়তে চেয়েছিলেন তাঁরাই বিপদকে ডেকে এনেছিলেন।

কথায় আছে, মানুষ না ঠেকলে শেখে না। যখনই পাখা যুক্ত করতে গিয়ে বিপদ দেখলো তখনই অন্যভাবে আকাশে ওড়ার পরিকল্পনা করলো। এ বিষয়ে প্রথম কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন ফ্রান্সের মঁগলফিয়ে ভ্রাতৃদ্বয়। বড় ভাইর নাম জোসেফ মিশেল মঁগলফিয়ে এবং ছোট ভাইর নাম জ্যাক এতিয়েন মঁগলফিয়ে। অনেক যত্নে ও অনেক পরিশ্রমে দু-ভাই মোটা কাপড় জড়িয়ে জড়িয়ে এবং কাপড়ের স্তরগুলিকে আঠা দিয়ে ভালভাবে এঁটে একদিন তৈরি করেছিলেন বিরাট এক বেলুন। উনানে খড়কুটো জ্বেলে এবং বেলুনের মুখটা তলার দিকে রেখে গরম হাওয়া দিয়ে ভরিয়ে দিয়েছিলেন বেলুনটিকে। অবশেষে বেলুনের মুখটাকে ভালভাবে দড়ি দিয়ে বেঁধে ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জুন তারিখে আকাশে উড়িয়েছিলেন। বেলুন আকাশে উড়েছিল বটে, কিন্তু কোন যাত্রী ছিল না তাঁদের সেই বেলুনে।

মঁগলফিয়ে ভাইদের বেলুন ওড়াতে দেখে মজা পেলেন অনেকে। এখানে সেখানে কত জনে ওড়ালেন বেলুন। বেলুনে গ্যাস পোরা সম্বন্ধেও চললো গবেষণা। চার্লস নামে একজন বিজ্ঞানী একদিন হালকা হাইড্রোজেন গ্যাসকে বেলুনে পুরে আকাশে ওড়ালেন। বেলুন এবার আরও সহজে এবং আরও উপরে উঠলো। কিন্তু চার্লসও আকাশে যাত্রী পাঠালেন না।

তিনমাস পরে সেই মঁগলফিয়ে ভাইরা পুনরায় বেলুন ওড়ালেন আকাশে। দিনটি ছিল ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের পনের তারিখ। এবার তাঁরা বেলুনের তলায় একটা খাঁচায় একটা ছাগল, একটা মোরগ এবং একটি ভেড়াকে পুরে ঝুলিয়ে দিলেন। এতগুলো প্রাণীকে নিয়ে বেলুন আকাশে উঠতেই চারদিকে হৈ হৈ পড়ে গেল। সবাই ভাবলেন, বেলুনে চেপে আকাশে একটা চক্কর দিয়ে আসা এমন কিছু কঠিন নয়।

ফ্রান্সে এবার বেলুন তৈরির ধূম পড়ে গেল এবং প্রত্যেক বেলুন নির্মাতাই

আকাশে উঠতে চাইলেন। কিন্তু বিরোধিতা করলেন সরকার। সেদিনের ধারণা ছিল, মানুষ আকাশে উঠলেই মারা যাবে।

বেলুন নির্মাতারা কিন্তু উৎসাহ হারালেন না। বারবার সরকারের কাছে আর্জি পেশ করলেন, একটিবার অন্ততঃ অনুমতি দিতে হবে। সরকার আর কি করে? বাধ্য হয়ে দুজন ফাঁসীর আসামীকে আকাশে ওঠার জন্য নির্দেশ দিলেন। ভাবটা এই, প্রাণদণ্ড যখন হবে তখন আকাশে গিয়ে ওরাই মরুক গে।

সরকারের সিদ্ধান্ত শুনে ভয়ানক দুঃখিত হলেন পিলাৎর দ্য রোজীর নামে জনৈক বিজ্ঞানী। সরকাকে জানালেন, আকাশে ওঠার প্রথম কৃতিত্ব দুজন সমাজবিরোধীর হওয়া উচিত নয়। ফাঁসীর আসামীদের বদলে তিনি নিজেই আকাশে উঠতে সম্মত আছেন।

অনেক ভেবে সরকার রোজীর কথাতেই রাজি হয়ে গেলেন এবং একদিন শুভক্ষণে রোজীর এবং তাঁর বন্ধু মার্কুইস দ্য আঁর্লাদ বেলুনে চেপে আকাশে উঠলেন। বেশ কিছুদূর গিয়ে এবং অনুকূল বাতাসে কিছুটা চালিত হওয়ার পর উভয়ে নির্বিঘ্নে নেমে এলেন মাটিতে।

এবার রোজীর যেন আকাশে ওঠার নেশা পেয়ে বসলো। দ্বিতীয়বার বেলুনে করে উঠলেন আকাশে। আর তাঁর দুর্ভাগ্য, আকাশে উঠেই প্রাণ হারালেন তিনি। সে সময় শুধু রোজীর নয়, দূর আকাশ সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা না থাকায় আরও অনেকে প্রাণ হারিয়েছেন। কেউবা বুদ্ধি বলে বিপদ কাটিয়ে ফিরে এসেছেন। তবুও দুঃসাহসীরা দীর্ঘকাল ধরেই বেলুনে চেপে আকাশে উঠেছেন এবং তাঁদের কাছ থেকে বিজ্ঞান লাভ করেছে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল সম্বন্ধে বিস্তর তথ্য যা পরবর্তীকালে মহাকাশ জয়ের সূচনায় বিজ্ঞানীদের অনেকখানি সাহায্য করেছিল।

বেলুনের একটা বড় অসুবিধা, চালকের ইচ্ছামত বেলুন চলে না। যেদিকে বাতাস প্রবাহিত হয় সেইদিকেই সে চালিত হয়। তবে একটা সত্য তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন, ভূপৃষ্ঠে বাতাস যে দিকে প্রবাহিত হচ্ছে কিছুটা উপরে বাতাস সেইদিকে প্রবাহিত না হয়ে অন্যদিকেও প্রবাহিত হচ্ছে। তাই বেলুনে বালির বস্তা নিয়ে গিয়ে আকাশের একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলে স্থির থাকার ব্যবস্থা করতেন এবং বায়ুর প্রবাহ ঠিক করে দিক পরিবর্তনেরও ব্যবস্থা করতেন।

তা সত্ত্বেও চালকের ইচ্ছাধীনে বেলুন থাকতো না এবং তেমন ভ্রমণের আনন্দও ছিল না। তাই সেই বেলুন নির্মাতারাই একদিন বিরক্ত হয়ে আকাশে ওড়ার অন্যভাবে পরিকল্পনা করলেন। তবে এও বুঝেছিলেন, পাখীর ডানার মত

নকল ডানা জুড়ে আকাশে কিছুতেই ওড়া যাবে না। সেই কারণে পাখা বা গ্লাইডারযুক্ত আকাশযানের হলো পরিকল্পনা। আর প্রথম সেই গ্লাইডারের পরিকল্পনা করেছিলেন জর্জ কলে নামে ইয়র্কশায়ারের একজন প্রযুক্তিবিদ।

জর্জ কলের গ্লাইডার পরিকল্পনাকে বিমান নির্মাণের ইতিহাসে একটি গুরুত্ব-পূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে ধরা হয়েছে। কলে নিজেই একটি যান তৈরি করেছিলেন কিন্তু কোন ইঞ্জিন যুক্ত করেননি। তাঁর প্রদর্শিত পথে এগিয়ে এসেছিলেন অনেকে এবং ঐ যানে চেপে অনুকূল হাওয়ায় কিছুটা ভেসে যেতে পারতেন। কিন্তু এই ছেলেখেলায় মন ভরলো না কারও। সবাই চাইলেন, ডাঙায় যেমন গাড়ী ছোটে তেমনই আকাশের বুক চিরে ছুটবে এমন এক যান যা একেবারে পাখীদের মত হবে এবং কোন কিছুকে অবলম্বন করবে না। কিন্তু কেমন করে সম্ভব হবে! অনেক ভেবেচিন্তে জন স্ট্রিংফেলো নামে একজন ইংরাজ প্রযুক্তিবিদ গ্লাইডারযুক্ত বিমানে ইঞ্জিন যুক্ত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। কতকগুলো মডেলও তৈরি করলেন তিনি, কিন্তু প্রকৃত আকাশযান নির্মাণ করে আকাশে উঠতে পারলেন না।

স্ট্রিংফেলোর পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে একদিন এগিয়ে এলেন অটো লিলিয়েন্থাল। ভাল প্রযুক্তিবিদ ছিলেন তিনি। একদিকে গ্লাইডারের যেমন উন্নতি সাধন করলেন অপরদিকে তেমনই নিঁখুতভাবে কলকব্জাও সংযুক্ত করলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অটো লিলিয়েন্থাল তাঁর যানকে আকাশে ওঠাতে সমর্থ হলেও যানসমেত আছাড় খেলেন মাটিতে। যানটিতো ভেঙ্গে চুরমার হলোই, আর তিনিও প্রাণে বাঁচলেন না।

• এবার এগিয়ে এলেন আমেরিকার দুই ভাই—উইলবার রাইট ও অরভিল রাইট। পূর্ববর্তী প্রচেষ্টাসমূহকে ভালভাবে পরীক্ষা করলেন এবং অটোলিলিয়ে-ন্থালের যানের ত্রুটিগুলি নির্ণয় করতে যত্নবান হলেন। পরিশেষে ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই ডিসেম্বর নব-নির্মিত যানে আরোহণ করে চারবার মাটি ছেড়ে আকাশে উঠলেন ও নামলেন। শেষবারের বার ৫৯ সেকেণ্ডে প্রায় সাড়ে আটশ' ফুট আকাশ পরিক্রমা করতেও সক্ষম হলেন।

রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের সেই উড়োজাহাজ কিন্তু জন্মমুহূর্তে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি। প্রায় দেড়বছর পরে অক্লান্ত পরিশ্রমে যখন নতুন উড়োজাহাজ তাঁরা তৈরি করলেন এবং অরভিল রাইট সেই জাহাজে চেপে প্রায় ২৪ মাইল পথ পাড়ি দিলেন তখনই অনেকের দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো ঐদিকে।

অরভিল রাইটের উড়োজাহাজে পরিক্রমার কিছুকাল পরে অর্থাৎ ১৯০৬

খ্রীষ্টাব্দে আর এক ধরনের আকাশযান তৈরি করেন জার্মানীর কাউন্ট ফার্ডিনাণ্ড জেপেলিন নামে এক ভদ্রলোক। এটি আকারে অনেকটা বেলুনের মত ছিল। অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে তৈরি সাত-আটশ ফুট লম্বা বিরাট এক যান। এর মধ্যে কতকগুলি খোপ ছিল এবং তার মধ্যে পুরে দেওয়া হতো হাইড্রোজেন গ্যাস। যানটির মধ্যে ইঞ্জিনও বসানো হয়েছিল। যেহেতু হাইড্রোজেন হালকা গ্যাস, সেই কারণে আকাশে ওঠার কোন সমস্যাই ছিল না। আর ইঞ্জিন যুক্ত থাকায় চালক যেদিকে খুশি চালিয়ে নিয়ে যেতে পারতেন। ঐ যানটি আবিষ্কর্তার নামেই নামকরণ করা হয়েছিল জেপেলিন। কথিত আছে, আমুণ্ডসেন জেপেলিনে চেপেই উত্তর মেরু ঘুরে এসেছিলেন।

আকাশ পরিক্রমার দু-দুটি হাতিয়ার প্রায় একই সঙ্গে মানুষ লাভ করায় কোনটি ভাল আর কোনটি মন্দ—এই নিয়ে শুরু হলো গবেষণা। দেখা গেল, এতবড় সুবৃহৎ যান যে জেপেলিন, তাতে মাত্র বিশজনের মত লোক স্থান পেতে পারে। গতিবেগও বেশী নয়, ঘণ্টায় প্রায় পঞ্চাশ মাইলের মত। অপরদিকে যে কোন সময়ে জেপেলিন দুর্ঘটনায়ও পড়তে পারে। তাই জেপেলিনকে বাদ দিয়ে প্রযুক্তিবিদরা উড়োজাহাজের উন্নতিতে যত্নবান হলেন।

কিছুকাল পরেই শুরু হয়ে গেল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। শত্রুকে পর্যুদস্ত করার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার মনে করে পাশ্চাত্যের দেশগুলি এবার উঠে পড়ে লেগে গেলেন উড়োজাহাজের উন্নতি সাধনে। বহু বিজ্ঞানী ও বহু প্রযুক্তিবিদ হস্তক্ষেপ করলেন এবার। ফলে অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে যাত্রীবাহী বিমান, বোমারু বিমান ইত্যাদি নানা ধরনের বিমান আত্মপ্রকাশ করলো। যে উড়োজাহাজ এককালে মাত্র একজনকে বহন করতে পারতো সেই উড়োজাহাজে এবার স্থান লাভ করলো চারজন লোক, তিনটি কামান এবং তিন হাজার পাউণ্ড গোলাবারুদ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে এ পর্যন্ত উড়োজাহাজের প্রভূত উন্নতি হয়েছে। আবিষ্কৃত হয়েছে কত নতুন ধরনের ইঞ্জিন। আগে একমাত্র পেট্রোল ইঞ্জিনই ব্যবহার করা হতো। বর্তমানে সেই পেট্রোল ইঞ্জিন প্রপেলার চালিত উড়োজাহাজে ব্যবহৃত হচ্ছে ঠিকই তবে দ্রুতগতিসম্পন্ন বিমানে পেট্রোল ইঞ্জিনকে ব্যবহার করা হয় না। সেই স্থান পূরণ করেছে জেট ইঞ্জিন। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের কিছু আগে এই ধরনের ইঞ্জিন আবিষ্কৃত হয়েছিল এবং জেট ইঞ্জিন আবিষ্কৃত হওয়ার ফলেই সম্ভব হয়েছে বিরাট বিরাট ফাইটার, বোম্বার্ড ও যাত্রীবাহী বিমান।

বিভিন্ন কাজের উপযোগী করার জন্য এখন নানা শ্রেণীর বিমান তৈরি হচ্ছে এবং ইঞ্জিনও তৈরি হচ্ছে নানা শ্রেণীর। গ্যাস টারবাইন যুক্ত করে যে সব

বিমানের প্রপেলার (বিমানের সামনের পাখা—যা উপর থেকে নিচে ঘুরে থাকে) ঘোরানো হয় তাদের বলা হয় প্রপেলার জেট বা টারবো জেট। এরা বেশ দ্রুত-গতিসম্পন্ন।

প্রপেলার জেট অপেক্ষাও দ্রুতগতিসম্পন্ন বিমান তৈরি করা হয় রকেট ইঞ্জিন ব্যবহার করে। এতে প্রপেলার থাকে না। ইঞ্জিনের এমন বৈশিষ্ট্য যে, একটি বিশেষ নলের মাধ্যমে পারিপার্শ্বিক বস্তু তথা বাতাসকে প্রবলবেগে অঙ্গীভূত করে নেয়। তারপর সেই বাতাসকে প্রবলভাবে চাপ প্রয়োগে সঙ্কুচিত করা হয়। অবশেষে জ্বালানীসহ দহন ও বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। দহনের ফলে উৎপন্ন হয় প্রচুর পরিমাণে গ্যাস। ঐ গ্যাস নির্গমণের কেবল একটিমাত্র নালীপথ বা জেট আছে। সেই পথে গ্যাস প্রবলভাবে চাপ প্রদান করে এবং তীব্রবেগে বাহিরে বেরিয়ে আসতে থাকে। ফলে যে ধাক্কা দেয় তাতে বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়ায় প্রচণ্ড চালিকাশক্তি লাভ করে বিমান।

আজকাল বিমানের গতিবেগ এমন বাড়ানো হয়েছে যে, কোন কোন জাতের বিমান ঘণ্টায় ২০০০ মাইলেরও বেশী পথ অতিক্রম করে। যা শব্দের গতিবেগের প্রায় তিনগুণ। অনুরূপ বিমান প্রথম ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই নির্মাণ করেছিল। আর শব্দের গতিবেগের সমান গতিবেগে (সেকেণ্ডে ১১২০ ফুট) প্রথম বিমান চালাতে সক্ষম হয়েছিলেন ক্যাপ্টেন ইয়েগার নামে এক বিমান চালক। আরও শোনা যায় মেজর হোয়াইট ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে বিমানের গতিবেগকে ৪০০০ মাইলের উপরে তুলতে পেরেছিলেন। তবে এমন গতিবেগে এখনও পর্যন্ত কোন বিমানকে চালনা করা হয় না।

বর্তমানে বিমানের চাহিদা অনেকখানি বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষকরে প্রতি-রক্ষাকে জোতদার করতে এবং শত্রুপক্ষকে পর্যুদস্ত করতে তৈরি হচ্ছে নানা শ্রেণীর বিমান। এমন আশ্চর্যজনক সে সব বিমান যে, রাডারের সাহায্যে অনেক সময় ধরা পড়ে না তাদের অস্তিত্ব।

অপরদিকে যাত্রীবাহী বিমানেরও অনেক উন্নতি হয়েছে। আগে যেখানে বিমান মাত্র একজন থেকে চারজনকে বহন করতো এখন সেখানে এক একটি বিমান চারশ' থেকে পাঁচশ' জন যাত্রীকে নিয়ে শব্দের গতিবেগের চেয়ে বেশী বেগে ছুটতে পারে।

বিমান যাত্রীর সংখ্যাও দিন দিন বেড়ে চলেছে। প্রতি বছর দশ কোটিরও বেশী লোক বিমানে দূর-দূরান্তরে যাত্রা করে। লণ্ডন, নিউইয়র্ক, শিকাগো প্রভৃতি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ব্যস্ত বিমানবন্দর।

বিমানের একটা অসুবিধা, আকাশে উঠবার আগে মাটির উপর দিয়ে বেশ কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার পর আকাশে উঠে যায়। তেমনই নামার সময়ও কিছুটা পথ দৌড়ে এসে তবে স্থির হয়। ঐ কারণে বিমানবন্দরে যথেষ্ট জায়গার দরকার হয় এবং দরকার হয় চাকার। আকাশে কোন জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকারও উপায় নেই।

বিমানের উপরোক্ত অসুবিধার জন্য পরের দিকে হেলিকপটার তৈরি হয়েছে। এরা খাড়াভাবে উপরে উঠে যায় এবং খাড়াভাবে মাটিতে নেমে আসে। আকাশে কোন জায়গায় কিছুক্ষণ স্থির অবস্থায়ও থাকতে পারে। তারজন্য হেলিকপটারের মাথায় থাকে পাখা। পাখা মাটির সমান্তরালে ঘুরতে পারে এবং ইংরাজীতে ওকে বলা হয় রোটর।

আরও এক ধরনের বিমান আছে—যাকে অটোজাইরো বলা হয়, তাতে মাত্র একজন আরোহীই আরোহণ করতে পারে। অটোজাইরোতে রোটর ও প্রপেলার দুই-ই থাকে।

আকাশ থেকে মহাকাশে

অতি প্রাচীনকাল থেকে মানুষ চাঁদ ও সূর্যকে নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা করে এসেছে। শুধু চাঁদ-সূর্য নয়, আকাশের তারাদের দেখেও চোখ ফেরাতে পারতো না। তাই চিরকালই মানুষের মন হরণ করে এসেছে আকাশের ঐ নীলিমা, রাতে মাথার উপর অসংখ্য আলোকবিন্দু, পূর্ণিমার চাঁদ, প্রজ্জ্বলন্ত সূর্য, ঊষা ও গোধূলির রক্তরাগ ইত্যাদি।

আগে মানুষ মহাকাশের বিপদের কথা জানতো না, জানতো না মহাকাশের বিস্তার, সূর্য-চন্দ্র-নক্ষত্রাদির দূরত্ব, পৃথিবীর আকর্ষণবল ও বায়ুমণ্ডলের ভয়ঙ্করতার কথা। উনবিংশ শতাব্দীতে আকাশে বেলুন ওড়ানোর হিড়িক পড়ে যাওয়ায় অনেকে বেলুনে চেপে এবং বেলুনে নানা ধরনের যন্ত্রপাতি পাঠিয়ে মহাকাশ সম্বন্ধে বহু তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। সেই প্রথম পৃথিবীর মানুষ বুঝতে পেরেছিল, পৃথিবী ছেড়ে ক্রমান্বয়ে উপরের দিকে এগিয়ে যাওয়া আদৌ সহজ নয়। মাত্র তিন মাইল উর্ধ্বে বাতাস এমন পাতলা হয়ে গেছে যে, তাতে শ্বাসকার্য চালানো যায় না। তাছাড়া পৃথীবীর নিজস্ব আকর্ষণবলও আছে। সেই আকর্ষণবলকে ছিন্ন করে উর্ধ্বে আরোহণ করতে গেলে মানুষের তৈরি কোন যানকে অন্ততঃপক্ষে সেকেণ্ডে সাত মাইলের মত গতিবেগ নিয়ে ছুটতে হবে। এত গতিবেগ উড়োজাহাজের মত কোন যানের পক্ষে সম্ভব নয় এবং বায়ুহীন পরিবেশে উড়োজাহাজের যন্ত্রও কাজ করতে অক্ষম।

মানুষ যন্ত্রযুগে পদার্পণ করায় এবং মহাকাশের বাধার কথা জ্ঞাত হওয়ায়, বাধাকে অতিক্রম করার উপায় চিন্তা করতে শুরু করলো। পৃথিবীর আকর্ষণবলকে ছিন্ন করার উপায় ভাবতে ভাবতে একদিন মনের কোণে ভেসে উঠলো চিরদিনের উপেক্ষিত হাউই তথা রকেটের কথা। সহস্র বছরেরও অধিককাল যে রকেট আত্মগোপন করেছিল বাজিকরদের অন্দরে সেই রকেটকে নিয়ে এবার শুরু হল গবেষণা। এ বিষয়ে প্রথমে জার্মানদের প্রচেষ্টাই সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। অবশ্য মহাকাশ জয় করার ইচ্ছা তাঁদের যতখানি ছিল তার চেয়ে অধিক ছিল উন্নত ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণ করা।

জার্মান ছাড়াও অপরাপর দেশের দু-একজন খেয়ালি বিজ্ঞানী মহাকাশে পাড়ি দেওয়ার জন্য চিন্তা-ভাবনা করতেন। তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে নাম করতে হয় প্রখ্যাত মার্কিন গণিতজ্ঞ রবার্ট হাচিন্স গডার্ডের। তাঁর ধারণা হলো,

রকেটকে মহাকাশে প্রেরণের উপযোগী করে তুলতে হলে রকেটে কঠিন জ্বালানী ব্যবহার করলে চলবে না। তখনই তিনি তরল বিস্ফোরকের অনুসন্ধান শুরু করেন এবং উৎক্ষেপণ করেন পর পর দুটি তরল জ্বালানীপূর্ণ রকেট। তাদের মধ্যে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জুলাই যে রকেটটিকে উৎক্ষেপণ করেন—সেটি শব্দের গতি-বেগে ঊর্ধ্বপানে অগ্রসর হয়েছিল। তবে খুব উচ্চে আরোহণ করতে সমর্থ হয়নি।

গডার্ডের কাজকে সেদিন কিন্তু কেউ সমর্থন করেনি। অধিকন্তু জনসাধারণ থেকে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত সবাই ভৎর্সনা করেছিলেন। ফলে গডার্ডের গবেষণা পরবর্তী গবেষকদের হাতে পড়ে উন্নত হতে পারেনি। দীর্ঘকাল উপেক্ষিত অবস্থায় পড়েছিল।

এদিকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষভাবে জার্মানীরা V_2-রকেট নামে এক অতি ভয়ঙ্কর ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণ করেছিল এবং মিত্রপক্ষের মধ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছিল। ঐ V_2-রকেটটি ছিল তরল জ্বালানীপূর্ণ রকেট। জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল অ্যালকোহল ও তরল অক্সিজেনকে। পাম্পের সাহায্যে দুটি জ্বালানীকে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে একত্রিত করে দহন প্রকোষ্ঠে অগ্নিসংযোগ করালেই উদ্ভুত গ্যাস আভ্যন্তরীণ চাপে সরু নির্গমন পথ দিয়ে সবেগে বেরিয়ে আসতো এবং বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়ায় প্রবলবেগে ধাবিত হতো রকেট। এর কোন চালকের দরকার হতো না।

যুদ্ধ শেষে রাশিয়া ও আমেরিকা উভয়েই জার্মানদের তৈরি V_2-রকেট সম্বন্ধে উৎসাহী হয়ে উঠে এবং নিজ নিজ দেশে অনুরূপ ক্ষেপণাস্ত্র তৈরির জন্য সচেষ্ট হয়। অবশেষে উক্ত রকেটের উন্নত রূপ প্রদান করার পরই মহাকাশে প্রেরণের উপযোগী হয়।

এবিষয়ে সর্বপ্রথম কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিল সোভিয়েত রাশিয়া। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা অক্টোবর রকেটের মাথায় স্পুটনিক-১ নামে একটি কৃত্রিম উপগ্রহকে স্থাপন করে উৎক্ষেপণ করেছিল মহাকাশে। এটির ওজন ছিল ১৮০ পাউণ্ড এবং এতে কোন আরোহী ছিল না।

রাশিয়ার দেখাদেখি মহাকাশ জয়ের জন্য আমেরিকাও তৎপর হয়ে উঠে এবং প্রায় এক বছরের মধ্যেই উভয় দেশ যেন প্রতিযোগিতায় মেতে উঠে। ফলে শত শত বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের প্রচেষ্টায় অল্পকালের মধ্যেই রকেটের নব রূপায়ণ ঘটে। কৃত্রিম উপগ্রহেরও উন্নতি হয় চূড়ান্তভাবে। অবশেষে মানুষের চিরন্তন অভিলাষ পূর্ণ হয় ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে জুলাই চন্দ্রকে জয় করার পর।

আর চন্দ্র জয়ের ফলে মহাকাশকেও মাথা নত করতে হলো মানুষের কাছে, অবগুণ্ঠন মোচন করতে হলো দূরের গ্রহ ও উপগ্রহদের, এমনকি সূর্যদেবকেও।

মানুষের মহাকাশ জয়ের পেছনে আছে সুবিশাল এক কর্মকাণ্ড। কত শত শত জনের সমবেত প্রচেষ্টা, কত অজস্র অর্থব্যয়, কত দীর্ঘকালের গবেষণা, ইত্যাদিকে একত্রিত করে তবেই মানুষ মহাকাশের রহস্য উদ্ঘাটিত করেছে এবং সফল অভিযানসমূহ প্রেরণ করেছে। মহাকাশের বাধাগুলি অতিক্রম করতে শুধু রকেটের উন্নতিসাধন নয়, কৃত্রিম উপগ্রহ ও আরোহী সম্বন্ধে যথেষ্ট সাবধানতা ও সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়েছে। অজস্র যন্ত্রপাতি সমন্বিত কৃত্রিম উপগ্রহ যখন মহাকাশ পরিক্রমা করে তখন তাকে নির্দেশ দিতে এবং উপগ্রহ থেকে নির্দেশ গ্রহণ করতে পৃথিবীর বুকে বেতার ও টেলি যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য দস্তুর মত একটা বিরাট অফিস স্থাপন করতে হয়।

বর্তমান কালের সবচেয়ে বড় বিস্ময় মহাকাশবিদ্যা ও কৃত্রিম উপগ্রহ ব্যবস্থা। কৃত্রিম উপগ্রহে আরোহণ করে মানুষ বেশ কয়েকবারই চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করেছে। আরোহীবিহীন কত উপগ্রহ প্রেরিত হয়েছে বিভিন্ন গ্রহে ও সূর্যের পানে। কতকগুলি এখনও ছুটে চলেছে মহাকাশ পানে। আর পৃথিবীকে প্রদক্ষিণও করছে এমনই কত উপগ্রহ। এখনও বছরে বছরে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রেরিত হচ্ছে একাধিক কৃত্রিম উপগ্রহ।

মানুষের এই যে মহাকাশ জয় এবং কৃত্রিম উপগ্রহকে মহাকাশে উৎক্ষেপণ—এর মূলে আছে একমাত্র রকেট ব্যবস্থা। পৃথিবীর আকর্ষণবলকে ছিন্ন করে উপগ্রহকে মহাকাশের বুকে স্থাপন করার ক্ষমতা একটিমাত্র রকেটের পক্ষে সম্ভব হয় না। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিন পর্যায়ের রকেটের ব্যবস্থা থাকে। অন্যদিকে প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা ও উপযুক্ত ঘাত সৃষ্টির ক্ষেত্রে কঠিন জ্বালানী একেবারে অনুপযুক্ত বলে তরল জ্বালানীর ব্যবস্থা করতে হয় রকেটে। সাধারণত কেরোসিন, গ্যাসোলিন, তরল হাইড্রোজেন ইত্যাদিকে জ্বালানীর জন্য এবং জ্বালানীকে দহন করতে উপযুক্ত জারক দ্রব্য হিসেবে তরল অক্সিজেনকে গ্রহণ করা হয়।

রকেটগুলিকে সজ্জিত করা হয় মূল মহাকাশযানের তলদেশে। সর্বনিম্ন রকেটে অগ্নিসংযোগ ঘটলে মহাকাশযানকে একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে ঠেলে দেয়। তারপর তার কাজ শেষ হলে আপনা-আপনি অগ্নিসংযোগ ঘটে দ্বিতীয় রকেটে। দ্বিতীয়টি তখন কাজ করতে শুরু করে দেয় এবং মহাকাশযানকে আরও উপরের দিকে ঠেলে নিয়ে যায়। দ্বিতীয় রকেটের শেষে সক্রিয় হয় তৃতীয় রকেট। বলাবাহুল্য এক একটি রকেটের কাজ শেষ হলে তার যন্ত্রাংশগুলি পথের মাঝেই

খসে পড়ে। দুই পর্যায়ের রকেটের কাজ শেষ হলেই মূল মহাকাশযান পৃথিবীর আকর্ষণের আওতা থেকে দূরে উৎক্ষিপ্ত হয়।

মহাকাশযানকে তৈরি করা হয় হালকা অ্যালুমিনিয়াম ধাতুর সঙ্কর দিয়ে। প্রচণ্ড গতিবেগ নিয়ে অগ্রসর হওয়ার সময়ে ঘর্ষণে প্রচণ্ড তাপের উদ্ভব হয় এবং ঐ তাপের প্রভাবে যাতে মহাকাশযান পুড়ে ছাই হয়ে না যায় তারজন্য তাপের কুপরিবাহী কাচের কতকগুলি আস্তরণ দেওয়া থাকে। ওতে মহাকাশের ক্ষতিকর রশ্মিগুলির বিকিরণ থেকেও রক্ষা পায় মহাকাশযান। অপরদিকে ঘর্ষণকে উপক্ষা করতে মহাকাশযানকে কাত করে ঘোরানো হয়।

মহাকাশযানে আরোহীকে প্রেরণ করতে গেলে আরোহীকে একটি ক্যাপস্থলের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখতে হয়। ক্যাপস্থলের মধ্যে থাকে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের অনুরূপ বায়ু। অপরদিকে মহাকাশচারীর পোষাকেরও এমনভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছে, যাতে ঐ পোষাকের মধ্যেও পৃথিবীর বায়ুচাপের সমান বায়ু ধরে রাখা যায়।

ক্যাপস্থলে অক্সিজেন সরবরাহের ব্যবস্থাও থাকে। মহাকাশচারীর নিঃশ্বাসে নির্গত কারবন ডাই-অক্সাইড গ্যাসকে বিশেষ উপায়ে অপসারণ করা হয় অথবা শোষণ করানো হয়। প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী যথা খাদ্য, পানীয় ও নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্র মজুত রাখা হয় মহাকাশচারীর হাতের কাছে।

মহাকাশচারীকে মহাকাশে প্রেরণের পূর্বে বহুদিন শিক্ষানবিশী করতে হয়। তাঁকে কলকব্জা সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করতে হয় এবং অর্ধশায়িত অবস্থায় থাকার অভ্যাস করতে হয়। মহাকাশে যেহেতু কোন অবলম্বন নেই, তাই পথিমধ্যে মহাকাশযানের যদি কোন যন্ত্রাংশ বিকল হয়ে যায় তাহলে তাঁকেই ঠিকঠাক করে নিতে হয়।

আশ্চর্য মানুষের বুদ্ধি ও কর্মতৎপরতা। হাজার হাজার বছর ধরে চলছিল তার স্থবির জীবন যাত্রা। যন্ত্রযুগ আরম্ভ হওয়ার মাত্র একশ বছরের মধ্যেই মানুষ জলে, স্থলে ও আকাশে সর্বত্র অজেয় হয়ে উঠেছে। অবশেষে ঘোর অন্ধকারের বুকচিরে দুর্বার গতিতে ছুটে চলেছে মহাশূন্যপানে। একদিন যা ছিল মানুষের কল্পনা, আজ তা বাস্তবে রূপায়িত। আশা করছে মানুষ, অদূর ভবিষ্যতে মহাশূন্যে গ্রহ-উপগ্রহে সফল অভিযান চালাতে মহাকাশের বুকে স্থাপন করবে ঘাঁটি। দীর্ঘপথ অতিক্রম করার পর বাস কিংবা ট্রেন স্টেশনে যেমন কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম করে, যাত্রীদের ওঠানো-নামানো করে, এও অনেকটা তেমনই হবে। দূর গ্রহের মহাকাশযানরা বিশ্রাম করে যাবে ক্ষণেকের জন্যে।

যানের কোন যন্ত্রপাতির গোলমাল হলে সারিয়ে নেবে, যাত্রীরা প্রতীক্ষা করবে নয়ত কিছুক্ষণ একটু ঘুরে বেড়াবে, ইত্যাদি নানা পরিকল্পনা মানুষের মাথায় ঘুরছে। আগামী একশ বছরের মধ্যে আরও যে কত কি হবে, তা এই মুহূর্তে বলা খুবই বিপজ্জনক। নতুন নতুন গবেষণা ও আবিষ্কারে এতই সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে যে, আজকের কথায় সেদিন কারও মন ভরবে না। হয়ত আগামী দু-এক দশকের মধ্যে আজকের লেখা ছোটদের কাছেও অত্যন্ত সেকেলে বলে পরিত্যক্ত হবে।

ভেলা থেকে জাহাজ

ভেলা দেখেছো তো, ভেলা ?

নদীর বুকে একগাদা বাঁশকে দড়িতে বেঁধে লগি ঠেলতে ঠেলতে এগিয়ে যায় কত জনে। এও একরকম ভেলা। গাঁয়ের ছেলেরা পুকুরে কলাগাছকে কেটে এবং পাশাপাশি কয়েকটাকে দড়িতে বেঁধে ভাসায়—সেও ভেলা। বন্যার সময় তরুণেরা কলাগাছগুলোকে লোহার রড দিয়ে গেঁথে ভারি চমৎকার সব ভেলা বানায়। ভেলার আরোহীকে সরু বাঁশের লগি নিয়ে ঠেলতে ঠেলতে এগিয়ে যেতে হয়। কলসী উপুড় করে ভেলা, কাঠের ভেলা, বাঁশের ভেলা, এমনই কত হরেক রকমের ভেলাই না তোমাদের চোখে পড়ে, কত গল্পেও ভেলার কথা পড়েছো তোমরা! মাঝ দরিয়ায় নৌকা কিংবা জাহাজডুবি হলে মাঝিমাল্লারা রবারের বায়ুভরা নৌকাকে ভেলার মত ব্যবহার করে, বেহুলা গাঙুড়ের জলে কলার ভেলা ভাসিয়েছিলেন, কোন কোন দুঃসাহসিক ভেলায় করে এখনও সাগর পাড়ি দিতে এগিয়ে আসেন ইত্যাদি কত কথা তোমাদের জানা। হয়ত কেউ কেউ ভেলায় চেপে আনন্দও লাভ করেছো।

কিন্তু জানো কি, একদা মানুষের একটিমাত্র যান ছিল এই ভেলা! আদি মানব ভেলায় চেপে সারা সাগরকে যেন চষে ফেলেছিল একদিন। কতকাল ধরেই না এর প্রচলন ছিল! নৌকা তৈরির পূর্ব পর্যন্ত কয়েক হাজার বছর ধরে চলেছিল ভেলার যুগ।

মানুষ যখন গুহায় বাস করতো তখন জল সম্বন্ধে তার প্রচণ্ড ভীতি ছিল। জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্যই হোক, অথবা বাহিরের মনোরম পরিবেশের জন্যই হোক, মানুষ গুহা ছেড়ে বেরিয়ে আসার পর ঘর বাঁধার প্রয়োজন অনুভব করলো। যেহেতু অরণ্যে সাপখোপ ও হিংস্র জন্তুর ভয়, খাদ্যও সেখানে পর্যাপ্ত ছিল না। অপরদিকে নদী কিংবা হ্রদের তীরে দেখতে পেলো প্রচুর শামুক, গুগলি, কাঁকড়া, মাছ; তীরভূমিতে দানা জাতীয় শস্য। তাই নদী কিংবা হ্রদের তীরে ঘর বাঁধার পরিকল্পনা করলো। কিন্তু দিনের বেলায় যাই হোক না কেন রাতে এখানেও ভয় প্রচুর। পাশে তৃণভূমিতে হিংস্র জন্তু এবং সাপখোপের উপদ্রব কিছু কম ছিল না। তাই বুদ্ধি খরচ করে নদী অথবা হ্রদের তীরেই শুরু করেছিল ঘর বাঁধতে।

জলের বুকে ঘর বাঁধতে গেলে কাঠকুটো বহন করতে হবে, ঘর থেকে পাড়ে

আসতে হবে, নদীতে ভেসে শিকার করতে হবে, কিন্তু বাহন হবে কে? বাহন খুঁজতে গিয়েই প্রথম ভেলা বানিয়েছিল মানুষ। শুকনো কাঠের গুড়িকে পরপর সাজিয়ে বুনো লতা দিয়ে ভাল করে বেঁধে ভেলার আকারে ভাসিয়েছিল জলে। পরের দিকে ভেলাকে এত বড় করে তারা বানাতো যে, একটি মাত্র ভেলায় পরিবারের সবাই, গৃহপালিত পশু, আসবাবপত্র সবকিছুই স্থান পেতে পারতো। আজকের মত ভেলাকে ঠেলার জন্য বাঁশ কিংবা কাঠের লগিকে ব্যবহার করতো।

ভেলার অসুবিধা ছিল অনেক। লাঠি ঠুকে ঠুকে এগিয়ে যেতে হয়, জোরেও চলে না। বেশী জলে চালাতে গেলে তত লম্বা লগিও পাওয়া যেত না। তখন বাধ্য হয়ে মানুষকে অন্য বুদ্ধি ফাঁদতে হলো। গাছের মোটা গুঁড়ির ভেতরটা পুড়িয়ে এবং পাথরের হাতিয়ার ঠুকে ঠুকে বহু যত্নে ও বহু পরিশ্রমে ডোঙার রূপ দিল। এবার কাঠের ফালিকে দাঁড়ের মত করে দিব্যি তরতর করে এগিয়ে যেতে পারলো। কিন্তু এই ডোঙায় একজন কিংবা দুজনের বেশী আরোহণ করতে পারতো না।

এই ভেলা এবং ডোঙার কাল কতদিন যে চলেছিল তা ঠিক করে বলার কোন উপায় নেই। প্রাচীন মিশরীয়রা পাথরের গায়ে এবং মৃৎপাত্রের গায়ে ছবি আঁকতো। সেই সব ছবি বেশ কয়েকটি পাওয়া গেছে। পুরাতত্ত্ববিদ্রা এই সব ছবির সময়কাল খ্রীষ্টজন্মের প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে বলে নির্ধারণ করেছেন। ছবিগুলি দেখে মনে হয়, সেকালে মিশরীয়রা প্যাপিরাসের বাণ্ডিল বেঁধে এবং শত শত বাণ্ডিলকে পর পর সাজিয়ে বিশাল এক ভেলা তৈরি করতো। এতে আরোহণ করতে পারতো পঞ্চাশ জনের বেশী। আরও মনে করা হয়, এই প্যাপিরাসের ভেলায় করে তারা বহু দূর দূর দেশেও যাত্রা করতো।

মিশরীয়দের সেইসব ভেলার আকার অনেকটা নৌকার মতই ছিল। নৌকার মত তাতেও থাকতো মাঝিমাল্লা এবং মাঝখানে ছাউনি। ওদের এই ভেলাকে নৌকার আদিরূপ বলে ধরা যেতে পারে। তবে ভেলা থেকে মানুষ কেমন করে যে পালতোলা নৌকায় এসেছিল, তা বলার কোন উপায় নেই।

এও সত্য যে, যেদিন মানুষ যা কিছু করতো তার পেছনে থাকতো দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফল। ডোঙা তো আগেই এসেছিল হাতে, তারপরে ডোঙাকে নৌকার রূপ দিতে চেষ্টা করেছিল মাঝখানটা মোটা ও দুদিকে সরু করে। মনে হয় নদী পথে যাতায়াত করতে করতে বাতাসের বেগেরও ধারণা হয়েছিল। দেখতো তারা, দাঁড় না ধরলেও অনুকূল হাওয়ায় ডোঙা কিংবা ভেলাকে ছেড়ে দিলে আপনিই এগিয়ে চলে। সেই থেকে সচেষ্ট হয়েছিল অনুকূল হাওয়াকে কাজে

লাগাতে। হয়ত কোন এক মহান শিল্পী দু-চারটে পশুর চামড়াকে একসঙ্গে জুড়ে লাঠি দিয়ে খাটিয়ে দিয়েছিল উপরে। তীব্র বেগে ছুটে চলেছিল সেই জলযান। আর যারা দেখেছিল তারা বাহবা দিয়েছিল এবং অনুকরণও করেছিল। আরও সত্য যে, ভেলা থেকে পাল তোলা নৌকায় আসতে অনেক ধাপ অতিক্রম করতে হয়েছিল এবং পালতোলা নৌকার আবির্ভাব হয়েছিল খ্রীষ্টজন্মের তিন হাজার বছরেরও অধিককাল আগে।

অনুরূপ সময় কালে আঁকা মিশরীয় চিত্রাবলী থেকে মনে করা হয়, মিশরীয়দের নৌকা কেবলমাত্র নদীতে যাতায়াত করতো না, সমুদ্রের উপকূল দিয়েও দূর দূর দেশে যাত্রা করতো।

সেকালের সভ্য মানুষ নৌকার উন্নতির জন্য যে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল— এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। প্রথমতঃ নৌকায় আরোহণ করলে হাঁটার পরিশ্রমকে উপেক্ষা করা যায়, দ্বিতীয়তঃ কোন জিনিসকে কষ্ট করে ঘাড়ে বহে বেড়াতে হয় না, তৃতীয়তঃ ডাঙার মত জলে দস্যু তস্কর ও হিংস্র জন্তুর ভয় নেই, চতুর্থতঃ দ্রুত যাওয়া যায় এবং অন্যান্য দেশের সঙ্গে সহজে যোগাযোগ স্থাপন করা যায়।

উপরোক্ত সুবিধাগুলির জন্য নৌকা একদিন জাহাজের রূপ নেয়। তবে সে জাহাজও ছিল এক ধরনের পালতোলা নৌকা। কাঠ দিয়ে তৈরি করা হতো, আকারে নৌকার চেয়ে বেশ কিছু বড় ছিল এবং অনেকগুলি পালের ব্যবস্থা ছিল। অনুকূল বাতাস এবং দাঁড়ের সাহায্য নিয়ে তারা এগিয়ে যেতো।

পালতোলা জাহাজের আরও উন্নতি হয় গ্রীক ও রোমানদের আমলে। গ্রীকরা ঐ পালতোলা জাহাজে করে তৎকালীন পৃথিবীর প্রায় সমূহ সভ্যদেশগুলির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন। রোমানদের আমলে পালতোলা জাহাজ এত বড় করে তৈরি করা হতো যে, তাতে দু-তিন তলা ঘর থাকতো।

পালতোলা জাহাজের প্রভূত উন্নতিসাধন করেছিল ভাইকিংরা। ওদের কুখ্যাতি যথেষ্ট আছে এবং ওদের জলদস্যুরূপেও চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। তবু অনেক অবদান আছে ওদের। স্কাণ্ডিনেভিয়ার (নরওয়ে, সুইডেন ও ডেনমার্ক) অধিবাসী ভাইকিংরা খ্রীষ্টীয় নবম ও দশম শতাব্দীতে তাদের তৈরি বিশেষ জাহাজে চেপে আটলান্টিক মহাসাগরকে একেবারে তোলপাড় করে ছেড়েছিল। ওরাই আবিষ্কার করেছিল আইসল্যাণ্ড ও গ্রীণল্যাণ্ডকে। কারও কারও মতে সুদূর উত্তর আমেরিকায়ও এর পদচিহ্ন অঙ্কিত করে এসেছিল।

অন্যদিকে ঐ সময়টায় ভারতবর্ষও নৌ-শিল্পে যথেষ্ট অগ্রসর ছিল। ভারতীয়

পালতোলা জাহাজ সুদূর মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপগুলিতে যাত্রা করতো —এমন প্রমাণ যথেষ্ট পাওয়া গেছে। আরও প্রমাণ পাওয়া গেছে, রোমানদের আমলে ভারত পালতোলা জাহাজ তৈরি করে দূর দেশে পাড়ি জমাতো।

ভাইকিংদের পরে জাহাজ নির্মাণে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিল পর্তুগীজ, মগ ও আরাকানের অধিবাসীরা। ইতিহাসে ওরাও কুখ্যাত জলদস্যু নামে চিহ্নিত। ইওরোপের রেনাসাঁসের যুগে যখন দেশ আবিষ্কারের হিড়িক পড়ে যায় তখন এমন সব পালতোলা জাহাজ তৈরি হয়েছিল, যেগুলির এক একটিতে চার-পাঁচতলা ঘর থাকতো এবং বহু লোকজনের কয়েক মাসের খাদ্য ও পানীয়কে বহন করার ক্ষমতা রাখতো। ভাস্কোডাগামার জাহাজ, ম্যাগেলানের জাহাজ, কলম্বাসের জাহাজ প্রভৃতি সবগুলিই চলতো রাশি রাশি পালের সাহায্যে। পাশ্চাত্যের ভেনিস, জেনোয়া প্রভৃতি বন্দরে অনুরূপ বিশাল বিশাল জাহাজ তৈরি হতো।

খ্রীষ্টপূর্ব তিন হাজার বা সাড়ে তিন হাজার অব্দ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত প্রায় পাঁচ হাজার বছর ধরে চলেছিল পালতোলা নৌকা ও জাহাজের যুগ। এর উন্নতিও হয়েছিল অতি ধীর ও মন্থর গতিতে। কিন্তু মানুষ যখন যন্ত্রযুগে পদার্পণ করলো তখনই জলযানের রূপটাকেও পরিবর্তন করতে চেষ্টা করলো। দাঁড় ও পালের পরিবর্তে নিয়োগ করতে চাইলো ইঞ্জিনকে। আর সেই সঙ্গে জলযানের ইতিহাসেও নবযুগের সূচনা হলো।

১৮০২ খ্রীষ্টাব্দের কথা। স্কটল্যাণ্ডের ক্লাইড নদীতে মালবোঝাই একখানা নৌকাকে বাষ্পীয় ইঞ্জিনের সাহায্যে প্রথম টানার ব্যবস্থা করেছিলেন উইলিয়ম সাইমিংটন। কিন্তু বাষ্পচালিত ইঞ্জিনকে যুক্ত করে প্রথম জলযান নির্মাণ করেছিলেন নিউইয়র্ক শহরের এক চিত্রকর—নাম রবার্ট ফুলটন এবং জলযানটির নাম ছিল কারমণ্ট। সেটি ছিল ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দ। ফুলটন তাঁর নতুন জলযানটিকে হাডসন নদীতে চালিয়েছিলেন এবং ৩২ ঘণ্টায় ১৫০ মাইল পথ অতিক্রম করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ফুলটন নির্মিত কারমণ্ট-ই প্রথম ইঞ্জিন দ্বারা চালিত জলযান। যদিও এটি আকারে জাহাজ অপেক্ষা অনেক ছোট ছিল, পালও রাখা হয়েছিল এবং সমুদ্রযাত্রার উপযোগী ছিল না। তবু অভিনবত্ব ছিল যথেষ্ট। একে তো ইঞ্জিন যুক্ত করা হয়েছিল, অপরদিকে জল কেটে সহজে যাতে এগিয়ে যেতে পারে তার জন্য পাখার ব্যবস্থা ছিল।

সেদিন ফুলটনের জাহাজের প্রতি কেউ উৎসাহ প্রদর্শন করেনি। বরং ফুলটনের কাজকে অনেকে বোকামি মনে করে ঠাট্টা করেছিল। নাম রেখেছিল ফুলটনস্ ফুলি অর্থাৎ ফুলটনের বোকামি। কিন্তু ফুলটন যখন তাঁর জাহাজটিকে

জলে ভাসিয়েছিলেন, পাল এবং দাঁড়ের সাহায্য না নিয়ে যখন শব্দ করতে করতে দ্রুতবেগে এগিয়েছিল তখন সবাই বিস্মিত না হয়ে পারেনি।

প্রথম যন্ত্রচালিত প্রকৃত জাহাজকে জলে ভাসিয়েছিল ইংলণ্ড। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে তেমনই একটি জাহাজ ১:৩ দিনে ইংলণ্ড থেকে কলিকাতায় এসে উপস্থিত হয়েছিল। নাম ছিল এনটারপ্রাইজ। কথিত আছে, সেদিন কেবলমাত্র ইঞ্জিনের উপরে তারা ভরসা করতে পারেনি। দাঁড় ও পালের ব্যবস্থা রেখেছিল। কেবল এনটারপ্রাইজ নয়, সে সময়ে যত জাহাজ তৈরি হয়েছিল তাদের প্রত্যেকটিতে বিকল্প হিসাবে দাঁড় ও পালের ব্যবস্থা ছিল। যন্ত্র তো! মহাসমুদ্রের মাঝখানে হঠাৎ যদি বিকল হয়ে যায় তাহলে গন্তব্যস্থলে পৌছবে কেমন করে? মাঝসমুদ্রে কি হাবুডুবু খাবে?

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যত জাহাজ তৈরি হয়েছিল, তাদের সবগুলির কাঠামো কাঠ দিয়েই তৈরি করা হতো। ঐ বছরই জাহাজের খোল তৈরি করতে প্রথম লোহা ব্যবহার করা হয়। লৌহনির্মিত প্রথম জাহাজ গ্রেটব্রিটেন। এতে কিন্তু পালের কোন সরঞ্জাম রাখা হয়নি। একেবারে আধুনিক ধরণের জাহাজ। পেছনে যুক্ত করা হয়েছিল স্ক্রু-প্রপেলার। অর্থাৎ পেছনে একটা মোটা লৌহ দণ্ডের গায়ে স্ক্রুর প্যাঁচের মত সারি সারি পাখার ব্যবস্থা ছিল। ইঞ্জিনের সাহায্যে পাখাকে ঘোরালে জল কেটে অতি সহজে জাহাজ এগিয়ে যেতে পারতো। অনুরূপ ব্যবস্থা এখনও গ্রহণ করা হয়। তবে আরও বেশী উন্নত করা হয়েছে।

এবার ইঞ্জিনের কথায় আসা যাক। আগে ব্যবহার করা হতো কাঠ কিংবা কয়লা। কঠিন এইসব জ্বালানীর সাহায্যে বাষ্প সৃষ্টি করে রেলগাড়ী, মোটর গাড়ী প্রভৃতির মত জাহাজকেও চালানো হতো। পেট্রোল ইঞ্জিন আবিষ্কৃত হওয়ায় অন্যান্য ইঞ্জিন বাতিল হলো এবং জাহাজেও যুক্ত হলো পেট্রোল ইঞ্জিন। অতঃপর শুরু হয় ডিজেল ইঞ্জিনের ব্যবহার। আরও পরের দিকে ডিজেল ইঞ্জিন ও বিদ্যুৎ দুইই ব্যবহার হতে শুরু করে। এবং এখনও ওদের যুগ শেষ হয়নি।

জাহাজ হয়ত অনেকেই তোমরা দেখেছো। কিন্তু কলিকাতা বন্দরে যে সব জাহাজ আসে তাদের চেয়েও অনেকগুণে বড় জাহাজ তৈরি হয়ে থাকে। খুব বড় জাহাজ কলিকাতায় ভিড়তে পারে না। সেই সব জাহাজ এত বড় যে, সেখানে যাত্রীদের জন্য খেলার মাঠ, সাঁতারের জন্য পুকুর, বেড়ানোর জন্য বাগান, সিনেমা হল, দোকানপাট, হোটেল প্রভৃতি আহার ও আনন্দোপকরণের সব ব্যবস্থাই থাকে।

প্রথম যে বড় জাহাজটি নির্মিত হয়েছিল, তার নাম ছিল কুঈন মেরী। জাহাজটি

লম্বায় ছিল ১০১৮ ফুট এবং চৌদ্দ তলা উচুঁ। এতে নাবিক সহ ৩২০০ জনের থাকার ব্যবস্থা ছিল। হল ঘর ছিল ২৫টি এবং খাওয়ার ঘরে ৯০০ জন একসঙ্গে বসে খেতে পারতো। এটির আটলান্টিক মহাসাগর পার হতে মাত্র তিনদিন সময় লাগতো। পরের দিকে জাহাজটিকে সমুদ্রের উপকূলে একটি ভাসমান হোটেলে পরিণত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় বড় জাহাজটির নাম ছিল কুঈন এলিজাবেথ। এটিও ছিল চৌদ্দ তলা, তবে লম্বায় ছিল ১০৩১ ফুট।

বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য জাহাজের ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেওয়া হয়। সবচেয়ে ছোট জাহাজকে বলা হয় স্টীমার। এরা দূরের যাত্রী নয়। অনেক সময় খেয়া পারাপারে ওকে নিয়োগ করা হয়ে থাকে। যাত্রীবাহী ও বাণিজ্যিক জাহাজ আকারে বড়। প্রচুর মালপত্র বহন করতে হয় এবং বহু যাত্রী থাকে। মাসের পর মাস ধরে একটানা চলতে হয়। তাই বড় না করে উপায় থাকে না।

যুদ্ধজাহাজরাই আকারে সবচেয়ে বড় হয়ে থাকে। এখনও পর্যন্ত যত যুদ্ধজাহাজ তৈরি হয়েছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড়টির নাম এনটারপ্রাইজ। ২৩ তলা উঁচু এই জাহাজের ছাদে একশ'টি উড়োজাহাজ থাকার ব্যবস্থা ছিল। জাহাজটিতে কাজ করতো প্রায় সাড়ে চার হাজার কর্মী।

জাহাজদের প্রধান দুটি বিভাগে ভাগ করা যায়। বাণিজ্যিক জাহাজ এবং যুদ্ধজাহাজ। অতি প্রাচীনকালে গ্রীকদের আমল থেকে উভয় কাজের উপযোগী পৃথক পৃথক ধরণের জাহাজ তৈরি হয়ে আসছে। ভাইকিংদের বাণিজ্যিক জাহাজ গোলাকার এবং যুদ্ধজাহাজ লম্বাটে ধরণের ছিল। মধ্যযুগে কোন কোন দেশ আবার উভয়কাজে একই ধরণের জাহাজকে ব্যবহার করতো। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে যুদ্ধোপকরণ বৃদ্ধি পাওয়ায়, উড়োজাহাজ-হেলিকপটার ইত্যাদিকে বহন করার প্রয়োজন হওয়ায় যুদ্ধজাহাজের নতুনভাবে পরিকল্পনা করতে হয়। এখন এমন এক একটি যুদ্ধজাহাজ তৈরি হচ্ছে যাদের এক একটি আধা-শহর বললেও ভুল করা হবে না। এই ধরণের কতকগুলো জাহাজের বিরাট নৌবহরও তৈরি হয়েছে এবং সেগুলি পরমাণুশক্তি চালিত। এক নাগাড়ে বছরের পর বছর তারা জলে ভেসে থাকতে পারে।

যুদ্ধে ব্যবহৃত হয় অপর এক ভয়ঙ্কর জাহাজের নাম ডুবোজাহাজ বা সাবমেরিন। মাঝখানটা মোটা এবং দুদিকে ক্রমশঃ সরু। সাধারণ জলযানের মত তৈরি হলেও ওর বাহিরে থাকে একট বহিরাবরণ। ফাঁকা অংশ জল কিংবা বাতাসে পূর্ণ করে রাখা হয়। এটির বৈশিষ্ট্য, প্রয়োজন হলে জলে ডুব দিতে

পারে। তারজন্য কতকগুলি জলের ট্যাঙ্ক থাকে এবং স্বয়ংক্রিয় মেসিনের সাহায্যে ট্যাঙ্কগুলিকে জলে পূর্ণ করলে আপনিই জলে ডুবে যায়। যখন ভাসার প্রয়োজন হয় তখন মেসিনের সাহায্যেই নিমেষে ট্যাঙ্ক থেকে জলকে নিষ্কাশন করে ফেলতে হয়। এতে ডিজেল ইঞ্জিন ইত্যাদি ব্যবহার করা হয় না। ব্যবহার করা হয় বৈদ্যুতিক মোটর। পেরিস্কোপ নামক যন্ত্রের সাহায্যে জলের তলা থেকে উপরের দৃশ্য দেখা যায়। গত বিশ্বযুদ্ধের সময় এই সাবমেরিন এবং টর্পেডো নামে ডুবো-বোমা মহাসমুদ্রে এক সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছিল।

এখন আবার সাগর-সম্পদ অনুসন্ধানের কাজে নতুন ধরণের জাহাজ তৈরি হচ্ছে। এমন কিছু কিছু জাহাজ তৈরি হয়েছে—যাতে মহীসোপান থেকে তেলকে উত্তোলিত করা হয় এবং উত্তোলিত অশোধিত তেলকে শোধন করারও ব্যবস্থা থাকে। তিমি শিকার ও তিমির চর্বি নিষ্কাশন করার সরঞ্জামযুক্ত জাহাজও তৈরি করা হয়।

সাগরবক্ষে জাহাজের বিপদ যথেষ্ট। ঝড়, কুয়াশা, ভাসমান বরফের পাহাড় তথা হিমশৈল ইত্যাদি নানাধরণের বিপদের সম্মুখীন হতে হয় জাহাজকে। অথচ একটি জাহাজ দুর্ঘটনায় নষ্ট হওয়া মানে বিরাট এক জাতীয় ক্ষতি। ঐ কারণে বন্দর থেকে জাহাজ যাত্রা করার সঙ্গে সঙ্গেই নানা ধরনের ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়। জাহাজটির সমূহ দায়িত্ব অর্পণ করা হয় ক্যাপ্টেনের উপরে। জাহাজের "ব্রিজে" তাঁকে সবসময় সক্রিয় থাকতে হয়। তাঁর হাতের কাছে মজুত থাকে কম্পাস, বেতার গ্রাহকযন্ত্র, রেডার থেকে সঙ্কেত গ্রহণের যন্ত্র ইত্যাদি অনেককিছু। আজকাল উপগ্রহ ব্যবস্থা জোরদার হওয়ায় অনেকখানি সুবিধা হয়েছে। উপগ্রহ মারফত বিপদের সম্মুখীন জাহাজের অবস্থান সহজে নির্ণয় করা যায় এবং ত্রাণের ব্যবস্থা করা হয়।

যখন পরমাণুশক্তি চালিত যে-সব নৌবহর তৈরি হচ্ছে তাদের বিপদ কিন্তু তত বেশী নয়। অপরদিকে একটি জাহাজকে চালাতে খরচ হয় প্রচুর পরিমাণে জ্বালানী। উক্ত কারণে আজকে নৌবহরে পারমাণবিক শক্তি ব্যবহারের তোড়-জোড় শুরু হয়েছে। আগামী দিনে পরমাণুশক্তি চালিত নৌবহরের সংখ্যা ধীরে ধীরে বেড়ে চলবে।

দৈহিক শক্তি থেকে অন্যান্য শক্তি

মানুষের আদিম সভ্যতা একমাত্র দৈহিক শক্তিকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছিল। নগরসভ্যতা পত্তনের পূর্বে মানুষকে বহুকাল গুহায় গুহায় এবং বনে বনে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। সে-সময় মানুষ যতটুকু উন্নতি করেছে তার মূলে ছিল একমাত্র গায়ের জোর। শক্ত হাতে পাহাড় থেকে পাথর ভেঙ্গে এনেছে, পাথর থেকে হাতিয়ার ও ব্যবহারিক জিনিসপত্র বানিয়েছে, শিকার করেছে এবং হিংস্র পশুদের সঙ্গে লড়াইও করেছে। আর এইভাবে কাটিয়েছে কত সহস্র সহস্র বছর! অবশেষে প্রস্তরযুগের শেষে মানুষ যখন পশুকে কর্মে নিয়োগ করলো তখনই বিকল্প একটা শক্তির সন্ধান পেলো এবং মানবসভ্যতা বিকাশের সুযোগ লাভও করলো।

প্রস্তরযুগের সভ্যতার পর মানুষ পত্তন করে নগরসভ্যতা। এই সভ্যতার মূলেও ছিল পশুশক্তি। পশুর দ্বারা অরণ্য থেকে কাঠ এবং পাহাড় থেকে পাথর বহে এনেছে, যুদ্ধক্ষেত্রে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছে, ভূমিকে কর্ষণ করেছে, নদী শাসন করতে নদীর বুকে বাঁধ দিয়েছে, এমনকি মরুভূমির বুকে পাড়িও জমিয়েছে।

অতীতে ব্যবহৃত বায়ুর শক্তি ও সৌরশক্তি– পশুশক্তিকে কাজে লাগানোর পর মানুষ বাতাসের শক্তিকে কাজে লাগাতে সচেষ্ট হয়েছিল। প্রথম বাতাসের শক্তিকে কাজে লাগিয়েছিল নৌকা ও জাহাজ চালানোর কাজে এবং পদ্ধতিটি আবিষ্কৃত হয়েছিল খ্রীষ্টপূর্ব তিন হাজার অব্দেরও আগে।

যতদূর জানা যায়, সৌরশক্তিকে প্রথমে কাজে লাগিয়েছিলেন গ্রীক আর্কিমিদিস। কতিপয় লেন্সের দ্বারা সূর্যরশ্মিকে কেন্দ্রীভূত করে শত্রুপক্ষের যুদ্ধ জাহাজকে ধ্বংস করেছিলেন তিনি। আর্কিমিদিসের পরে অনুরূপ ধ্বংসাত্মক কর্মে আরও অনেকে সৌরশক্তিকে ব্যবহার করেছিলেন।

প্রাচীন ভারতবর্ষ কিন্তু সৌরশক্তি ব্যবহারের এক অভিনব পন্থা আবিষ্কার করেছিল। অনেকের মতে সূর্যরশ্মিকে ব্যবহার করা হতো রোগ নিরাময়ের কাজে। কিন্তু পদ্ধতিটি হারিয়ে গেছে অনেককাল আগে।

বায়ুপ্রবাহকে পরোক্ষভাবে সৌরশক্তির প্রকাশ ধরতে হবে। সূর্যকিরণে পৃথিবীর স্থলভাগের উপরিস্থিত বায়ু মণ্ডলের বায়ু উত্তপ্ত হলে হালকা হয়ে উপরে উঠে যায়। ফলে জলভাগের উপরিস্থিত ভারি বায়ু সেই স্থান দখলের জন্য ছুটে

আসে এবং তারই ফল বায়ুপ্রবাহ। যতদূর জানা যায়, এই বায়ুপ্রবাহকে প্রত্যক্ষ-ভাবে যান্ত্রিক সরঞ্জামের মাধ্যমে কাজে লাগানো হয়েছে ১১৯১ খ্রীষ্টাব্দে। সেদিন ইংলণ্ডেই প্রথম বায়ুচালিত কলের উদ্ভাবন হয়েছিল।

আদিতে বায়ুকল বা উইণ্ডমিল ছিল একটা সোজা খুঁটির উপর বসানো একটা বাক্সের মত। বাতাসের দিকে থাকতো চারখানা ছোট ছোট পাল। পালে বাতাস ধরলে দ্রুতগতিতে চাকা ঘুরতো এবং সেই চাকা দিয়ে ভাঙ্গা হতো গম।

পরের দিকে এই বায়ুকলের আরও উন্নতি হয় এবং পালের পরিবর্তে পাখার প্রবর্তন হয়। এক সময় হল্যাণ্ডে অনুরূপ বায়ুকলের সাহায্যে কেবল শস্য ভাঙ্গা হতো না, কূপ থেকে জল তোলা হতো এবং জমিতে সেচও দেওয়া হতো। সাধারণত ইট গেঁথে বেশ উঁচু একটা গম্বুজের মত করে উপরে একটা দণ্ডের গায়ে পাখা যুক্ত করা হতো। তাই ওকে বলা হতো টাওয়ার মিল।

জলশক্তি—জলের শক্তিকে কাজে লাগানোর ব্যবস্থাও অতি পুরাতন। প্রাচীন মিশর, সিরিয়া, গ্রীস প্রভৃতি দেশ পাহাড়ী নদী ও জলপ্রপাতের খাড়া জলস্রোতের সাহায্যে চাকা বা টারবাইন ঘোরাতো এবং সেই টারবাইনের দ্বারা যাঁতা ঘোরানোর ব্যবস্থা করে গম ভাঙ্গতো। এমন ব্যবস্থা ইওরোপে মধ্যযুগ পর্যন্তও চলে আসছিল।

জলের শক্তিকে প্রকৃতপক্ষে আজকের দিনেই কাজে লাগানো হয়েছে নদী পরিকল্পনাগুলির মাধ্যমে। ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে ফুর্ণের নামে জনৈক ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার উন্নত ধরণের টারবাইন আবিষ্কার করায় জলশক্তিকে ভালভাবে কাজে লাগানোর ব্যবস্থা শুরু হয়। অবশেষে ডায়নামো আবিষ্কৃত হলে জলবিদ্যুৎ তৈরি করার ব্যবস্থা হয়।

উচ্চস্থান থেকে যখন জল প্রবলবেগে টারবাইনের চাকার উপর পড়তে থাকে তখন আপনা হতেই টারবাইনের চাকা ঘোরে। টারবাইনের চাকার সঙ্গে ডায়নামোর সংযোগ থাকে এবং টারবাইনের চাকা প্রচণ্ডবেগে আবর্তিত হলেই ডায়নামো থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। ডায়নামো ঘোরাতে ইঞ্জিনের দরকার হয় না। আজকের দিনে প্রায় সবদেশেই নদীর মুখে বাঁধ দিয়ে টারবাইন ঘোরানোর ব্যবস্থা হয়েছে এবং দেশে বিদ্যুতের চাহিদা পূরণ করছে।

বাষ্পশক্তি—বাষ্পশক্তিকে প্রথম কাজে লাগিয়েছিলেন নিউকোমেন নামে একজন কর্মকার। ভদ্রলোক লোহার কাজ করতেন। ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে একটি খনি

থেকে জল নিষ্কাশন করার জন্য তিনি ব্যবহার করেছিলেন বাষ্পচালিত ইঞ্জিন। সেদিনের সেই ইঞ্জিন ছিল অতি সাধারণ। বয়লারে জল ফুটিয়ে উৎপন্ন বাষ্পকে একটি চোঙের ভেতর পঠিয়ে চোঙের পিস্টনকে ওঠানামা করিয়েছিলেন।

নিউকোমেনের একটি স্টীম ইঞ্জিনের মডেল গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিল। ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ঐ মডেলটিকে সারাতে দেওয়া হয়েছিল জেমস ওয়াটকে। জেমস-ওয়াট ইঞ্জিনটি দেখে মুগ্ধ হন এবং বাষ্পকে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে উন্নত ধরণের ইঞ্জিন প্রস্তুত করতে যত্নবান হন।

নিউকোমেনের ইঞ্জিনের কোন জনপ্রিয়তা ছিল না। উক্ত ইঞ্জিনে জলীয় বাষ্প অপচয় হতো প্রচুর পরিমাণে। জেমস ওয়াট লক্ষ্য করেন, বাষ্পকে চেপে রাখলে সে বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়ায় একটা প্রচণ্ড ধাক্কা দেয়। সেই ধাক্কাকে কাজে লাগানোর জন্য এক নতুন ধরণের কনডেনসার আবিষ্কার করেন জেমস ওয়াট এবং ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে তৈরি করেন এক নতুন ধরণের বাষ্পচালিত ইঞ্জিন।

জেমস ওয়াট স্টীম ইঞ্জিনের উন্নতি সাধন করতে বহু প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। প্রায় পঁচিশ বছর ধরে একটানা পরিশ্রমের পর আরও উন্নত ধরণের স্টীম ইঞ্জিন আবিষ্কার করেন। ঐ সময় তিনি একটি কারখানা স্থাপন করেন এবং প্রস্তুত করেন প্রায় পাঁচশ'টি ইঞ্জিন।

জেমস ওয়াটের পরে আরও অনেকে স্টীম ইঞ্জিনের নতুন রূপ দিতে এগিয়ে আসেন। তাঁদের মধ্যে ট্রেভিথিক নামে এক ইঞ্জিনিয়ারের অবদান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরই প্রচেষ্টায় স্টীম ইঞ্জিনকে রেলগাড়ী, জাহাজ ইত্যাদিতে যুক্ত করার উপযোগী হয়।

প্রথম প্রথম ইঞ্জিনকে চালাতে যে বাষ্পের প্রয়োজন হতো তা সরবরাহ করতো জলীয় বাষ্প। উদাহরণস্বরূপ নিউকোমেনের ইঞ্জিনের কথা ধরা যেতে পারে। একটি বয়লারে জলকে ফুটিয়ে বাষ্পে পরিণত করা হতো। তারপর সেই বাষ্প বায়ুমণ্ডলের চাপে পিস্টনের তলা দিয়ে একটি সিলিণ্ডার বা চোঙের মধ্যে প্রবেশ করতো। সেখানে ঠাণ্ডা জলের ধারায় জলীয় বাষ্পকে ঘনীভূত করালে একটা শূন্যতার সৃষ্টি হতো এবং বাহিরের বায়ুর চাপে পিস্টন আপনাহতে ভেতরের দিকে প্রবেশ করতো। পিস্টনের রডকে বিশেষ সরঞ্জামের দ্বারা এমন-ভাবে আটকানো হতো যে, পিস্টন ভেতরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে পিস্টনরডের হাতলটা ঘুরে যেতো এবং সেখানে ভার পড়লে পিস্টন পুনরায় সরে যেতো বাহিরের দিকে। তারপর আবার শূন্যতার সৃষ্টি হতো এবং পূর্বের মত কাজ

করতো। আর এইভাবেই দ্রুত ওঠানামা করতো পিস্টন। অর্থাৎ ইঞ্জিনের কাজ শুরু হতো। জেমস ওয়াট কিন্তু তাঁর সুবিখ্যাত "সান এণ্ড প্লানেট গিয়ার" এবং ফ্লাই হুইলের মাধ্যমে বাষ্পকে পর্যায়ক্রমে পিস্টনের তলদেশ দিয়ে এবং উপর দিয়ে প্রবেশ করিয়ে পিস্টনকে ওঠানামা করিয়েছিলেন।

জেমস ওয়াটের পর থেকে ইঞ্জিনের অনেক-অনেক উন্নতি হয়েছে। জলীয় বাষ্পের পরিবর্তে জ্বালানী দহনের দ্বারা উৎপন্ন হচ্ছে গ্যাস এবং ঐ গ্যাসের দ্বারা পিস্টন ওঠানামা করে। প্রথমে জ্বালানী হিসাবে কয়লাকে কাজে লাগানো হয়েছিল এবং কয়লাকে দহন করা হতো বাহিরে। পেট্রোল ইঞ্জিন ও ডিজেল ইঞ্জিনে জ্বালানী তথা পেট্রোল ও ডিজেলকে বাহিরে দহন করার প্রয়োজন হয় না। সিলিণ্ডারের মধ্যেই দহন করা হয় এবং উৎপন্ন হয় গ্যাস। এদের তাই বলা হয় ইনটারন্যাল কম্বাশন ইঞ্জিন বা অন্তর্দহ ইঞ্জিন।

অন্তর্দহ ইঞ্জিনের প্রথম স্রষ্টা ফ্রান্সের "লেনোর"। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে ইঞ্জিনের মধ্যে বাতাস ও গ্যাসের মিশ্রণের মধ্যে বিদ্যুৎস্ফুলিংগ পাঠিয়ে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিলেন। তবে অন্তর্দহ ইঞ্জিনের প্রকৃত স্রষ্টা গটলিয়েব ডেমলার। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনিই উচ্চক্ষমতাযুক্ত পেট্রোল ইঞ্জিন আবিষ্কার করেন। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে রুডলফ ডিজেল কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়েছে ডিজেল ইঞ্জিন। পেট্রোল ইঞ্জিন হালকা হলে কি হবে, ডিজেল ইঞ্জিনের সুবিধা বেশী হওয়ায় বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া এখন ডিজেল ইঞ্জিনের ব্যবহারই ব্যাপক হয়ে উঠেছে।

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে গ্যাসটারবাইন আবিষ্কার ইঞ্জিনকে আরও কার্যকরী এবং আরও নবরূপে রূপায়িত করেছে। এর আবিষ্কর্তা বিখ্যাত বৃটিশ প্রযুক্তিবিদ পার্‌সন। তবে একই সময়ে "লাভাল" নামে সুইডেনের এক প্রযুক্তিবিদও যন্ত্রটি আবিষ্কার করেছিলেন। গ্যাসটারবাইনকে প্রাকৃতিক গ্যাস অথবা কেরোসিন গ্যাস দিয়ে চালানো হয়। টারবাইনের চাকা ইঞ্জিনের মধ্যে থাকে এবং ওকে ঘোরানো হয় উত্তপ্ত গ্যাস প্রবাহের মাধ্যমে। টারবাইনে প্রবেশ করলেই গ্যাস আয়তনে বৃদ্ধি পায় এবং আপনাহতেই ঘোরায় টারবাইনের চাকাকে। ডিজেল ইঞ্জিন অপেক্ষা এই ইঞ্জিন আরও শক্তিশালী এবং সুবিধাও পাওয়া যায় অনেক। তাই আজকাল জাহাজে, উড়োজাহাজে এবং রেলগাড়ীতে এর ব্যবহার ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। উত্তপ্ত গ্যাস ছাড়া স্টীম দিয়েও টারবাইনের চাকাকে ঘোরানো যায় এবং এর গঠন গ্যাসটারবাইন থেকে কিছু পৃথক। চার্লস পার্‌সন যে টারবাইনটি আবিষ্কার করেছিলেন সেটি ছিল স্টীম-টারবাইন।

বিদ্যুৎশক্তি – বিদ্যুৎশক্তিকে কাজে লাগিয়ে মানুষ আজ অসাধ্যকে সাধন করেছে। আজ বিদ্যুৎশক্তি ছাড়া মানবসভ্যতা যেন কল্পনাই করা যায় না। বাড়ী-ঘর, কলকারখানা ও রাস্তাঘাটকে আলোকিত করতে; টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, রেডিও, রেডার প্রভৃতি যোগাযোগের মাধ্যমকে চালু রাখতে; ট্রেন, ট্রাম, জাহাজ প্রভৃতি যানবাহনকে চালাতে; সিনেমা, টেলিভিসন প্রভৃতি আনন্দোপকরণের ব্যবস্থা করতে; চিকিৎসার অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি চালাতে, ইত্যাদি প্রায় সর্বক্ষেত্রেই প্রয়োজন হচ্ছে বিদ্যুতের।

অথচ ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে বিদ্যুতের ব্যবহার মানুষ জানতো না বললেও বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে ডায়নামো এবং ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে বৈদ্যুতিক বাল্ব-আবিষ্কারই প্রকৃতপক্ষে বিদ্যুৎ ব্যবহারের পথকে উন্মুক্ত করে দিয়েছে।

অপরাপর সবকিছুর মতই বিদ্যুতের ইতিহাস আছে। আকস্মিকভাবে মানুষ একে হস্তগত করেনি। বহু গবেষকের গবেষণাকে অবলম্বন করে তিলে তিলে গড়ে উঠেছে তিলোত্তমা হয়ে।

কথিত আছে, বিজ্ঞানের প্রায় প্রতিটি শাখার গোড়াপত্তন করেছিল গ্রীক-বিজ্ঞানীরা। তড়িৎবিজ্ঞানও তার ব্যতিক্রম নয়। তবে তাঁদের ধারণা ছিল কেবলমাত্র স্থির তড়িৎ সম্বন্ধে। কথিত আছে, খ্রীঃ পূঃ ৬০০ অব্দের দিকে গ্রীক পণ্ডিতেরা লক্ষ্য করেছিলেন, একজাতীয় পাইন গাছের শক্ত আঠা বা অ্যাম্বারকে রেশমী কাপড় দিয়ে ঘষলে অতি হালকা কোন জিনিসকে আকর্ষণ করতে পারে। কিন্তু এ সম্বন্ধে তাঁরা বিশেষ চিন্তাভাবনা করেননি বলে মনে হয়।

গ্রীক পণ্ডিতদের আমল থেকে কত কাল কেটে গেল। দু-হাজার বছরেরও অধিককাল পরে ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁদের সেই পরীক্ষাটির প্রতি দৃষ্টি পড়ে ইতালীয় রেনাসাঁস যুগের বিজ্ঞানী গিলবার্টের। গিলবার্ট তখন ঐ স্থির তড়িৎ সম্বন্ধে গবেষণা শুরু করেন।

আরও কেটে গেল কত কাল। গিলবার্টের আমল থেকে বিজ্ঞানীরা কেবলমাত্র ঐ স্থির তড়িৎ নিয়েই মত্ত ছিলেন। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে সন্ধান পাওয়া গেল প্রবাহী তড়িতের। এটি সম্ভব হয়েছিল বিজ্ঞানী ভোল্টার ভোল্টীয় স্তূপ আবিষ্কারের মাধ্যমে। সেই প্রথম জানা গেল, বিদ্যুৎ পরিবাহীর মাধ্যমে একজায়গা থেকে অন্য জায়গায় প্রবাহিত হয়।

১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে ঘটলো এক অভূতপূর্ব ঘটনা। কোপেন হেগেনের এক অধ্যাপক হ্যানস ক্রিশ্চিয়ান উরস্টেড হঠাৎ আবিষ্কার করলেন চুম্বকের উপর তড়িৎপ্রবাহের ক্রিয়া। উরস্টেডের আবিষ্কারের প্রায় দশ বছর পরে ১৮৩১

সালে মাইকেল ফ্যারাডের দ্বারা আবিষ্কৃত হলো তড়িৎ-চুম্বকীয় আবেশ। সেইখানেই নিহিত হলো ডায়নামো প্রস্তুতির মূল নীতি। পরিশেষে বৈদ্যুতিক বাল্ব আবিষ্কৃত হওয়ায় বিদ্যুৎ ব্যবহারের বিভিন্ন দিক উন্মোচিত হলো।

বর্তমানে বিদ্যুৎ সরবরাহের দুটি মাধ্যম ব্যাটারি ও ডায়নামো। ব্যাটারি বলতে বিদ্যুৎ উৎপাদক যন্ত্র। এই যন্ত্রে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় রাসায়নিক ক্রিয়ায়। সাধারণত দু-ধরনের ব্যাটারি ব্যবহার করা হয়। নির্জল কোষ বা ড্রাই-সেল এবং সঞ্চয়ক কোষ বা অ্যাকিউমুলেটার। সঞ্চয়ক কোষকে স্টোরেজ সেল বা সেকেণ্ডারী সেলও বলা হয় এবং এতেই সুবিধা বেশী।

ড্রাই-সেলকে টর্চে ব্যবহার করা হয়। ঐ ব্যাটারির প্রধান অসুবিধা, একটি ব্যাটারি থেকে মাত্র ১½ ভোল্ট বিদ্যুৎ পাওয়া যায়। বেশী কাজ করতে হলে অনেকগুলো ব্যাটারিকে একসঙ্গে যুক্ত করতে হয়। অপরদিকে বিদ্যুৎ উৎপাদন বন্ধ হয়ে গেলে ব্যাটারিকে ফেলে দিতে হয়। সঞ্চয়ক কোষে কিন্তু এমনটি হয় না। এক একটি কোষ থেকে ১২ ভোল্টের মত বিদ্যুৎ পাওয়া যায় (কম ভোল্টের কোষও আছে)। অকেজো হয়ে গেলেও ভয় নেই। পুনরায় বিদ্যুৎ প্রবাহিত করিয়ে কার্যকর করা হয়। বর্তমানে ড্রাই-সেলেরও অনেক উন্নতি হয়েছে। এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, যাতে এক বিশেষ ধরনের ড্রাই-সেলকে ফেলে না দিয়ে পুনরায় কাজের উপযোগী করা হচ্ছে।

যেখানে বেশী বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রয়োজন হয় সেখানে যে কোন ধরণের ব্যাটারি একেবারে অচল। এ-ক্ষেত্রে দরকার হয় জেনারেটার বা ডায়নামো। ডায়নামোর প্রধান অংশ তারের কুণ্ডলী বা আর্মেচার এবং এই আর্মেচারকে ঘোরানো হয় একটি শক্তিশালী অশ্বক্ষুরাকৃতি চুম্বকের দুই মেরুর মধ্যস্থলে। আর্মেচার তথা তারের কুণ্ডলীকে ঘোরাতে গেলে ইঞ্জিনেরই সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। তখনই উৎপন্ন হয় বিদ্যুৎ।

ইঞ্জিনের সাহায্য গ্রহণ করতে গেলে প্রচুর জ্বালানীর খরচ হয়। তাই জলস্রোতের সাহায্যে টারবাইন ঘুরিয়ে ডায়নামো থেকে লাভ করা হয় বিদ্যুৎ। অনুরূপ উপায়ে প্রাপ্ত বিদ্যুৎকে বলা হয় জলবিদ্যুৎ।

বিদ্যুতের চাহিদা যেভাবে বেড়ে উঠেছে তাতে জলবিদ্যুৎও অভাব পূরণ করতে পারছে না। তারজন্য তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, পারমাণবিকশক্তি কেন্দ্র ইত্যাদি স্থাপন করতে হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই তাপশক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়।

পারমাণবিক শক্তি—যে কোন মৌলিক পদার্থ অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরমাণুর সমষ্টি। সেই পরমাণুরা আবার অবিভাজ্য নয়। প্রতিটি পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রক। নিউক্লিয়াসে প্রধানত ধনাত্মক প্রোটন কণিকা ও তড়িৎ নিরপেক্ষ নিউট্রন কণিকা পিণ্ডাবদ্ধ অবস্থায় থাকে। আর সৌরজগতে সূর্যকে কেন্দ্র করে গ্রহরা যেমন এক একটি নির্দিষ্ট কক্ষে সূর্য পরিক্রমা করে তেমনই নিউক্লিয়াসের চারদিকে নির্দিষ্ট সংখ্যক ইলেকট্রন নিজ নিজ কক্ষে থেকে পরিভ্রমণ করে।

পরমাণুর নিউক্লিয়াসের কণাগুলোকে সহজে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। তবে বাহির থেকে প্রোটন, নিউট্রন ইত্যাদির দ্বারা পরমাণুর নিউক্লিয়াসকে তীব্রভাবে আঘাত করলে অনেক সময় নিউক্লিয়াসের একটা টুকরা ভেঙ্গে পড়ে এবং কিছু শক্তি নির্গত হয়। তবে ভেঙ্গে পড়া টুকরাটুকু এমন কিছু উল্লেখযোগ্য নয়। অর্থাৎ বাহির থেকে আঘাতের ফলে নিউক্লিয়াসের এমন ক্ষুদ্র অংশ বিচ্ছিন্ন হয় যে, নিউক্লিয়াসটা প্রায় অক্ষতই থেকে যায় বললে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু ইউরেনিয়াম-২৩৫ নামক মৌলটি—যার নিউক্লিয়াসে থাকে ১৪৩টি নিউট্রন এবং ৯২টি প্রোটন, তার নিউক্লিয়াসকে নিউট্রন দ্বারা আঘাত করলে নিউক্লিয়াসটি সমান দুটি টুকরাতে বিভক্ত হয়ে যায়। অনুরূপভাবে নিউট্রনের আঘাতে নিউক্লিয়াসকে বিভক্তকরণকে বলা হয় নিউক্লিয় বিভাজন বা নিউক্লিয়ার ফিসন।

ঘটনাটি প্রথম ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রত্যক্ষ করেন অটোহান ও স্ট্রাসম্যান নামক দুজন বিজ্ঞানী। তাঁরা আরও লক্ষ্য করেন, ইউরেনিয়াম-২৩৫ এর নিউক্লিয়াসকে কেবল দুটি সমান টুকরায় বিভক্ত করা যায় না, নিউট্রন দিয়ে আঘাত করলে দুটি অথবা তিনটি নিউট্রনও নিউক্লিয়াস থেকে বিচ্যুত হয়। বিচ্যুত ঐ মুক্ত নিউট্রনগুলি আবার নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে থাকে না, মুক্ত হওয়া মাত্রই পাশাপাশি পরমাণুর নিউক্লিয়াসগুলিকে বিভাজন ঘটাতে শুরু করে দেয় এবং প্রতিবারেই নির্গত হয় দু-তিনটি করে নিউট্রন। পুনরায় সেগুলিও বিভাজন করতে এগিয়ে যায় এবং এই-ভাবে বিভাজনের ব্যাপারে একটা শৃঙ্খলবিক্রিয়া চলতে থাকে।

ব্যাপারটাকে একটু সহজভাবে বললে এই দাঁড়ায় যে, এক টুকরা ইউরেনিয়াম-২৩৫-এ অসংখ্য পরমাণু আছে। একট নিউট্রন দিয়ে একটি পরমাণুকে বিভাজিত করলে ধরা যাক, প্রথমে তিনটি নিউট্রন মুক্ত হল। এই তিনটি নিউট্রন পরক্ষণেই বিভাজিত করলো অপর তিনটি পরমাণুকে। এবার নির্গত হল তিনটি থেকে মোট ৯টি নিউট্রন। ৯টি নিউট্রন দ্বারা বিভাজিত পরমাণু থেকে আবার মুক্ত হবে (৯×৩) বা ২৭টি নিউট্রন। এইভাবে মুহূর্তের মধ্যেই অসংখ্য পরমাণু বিভাজিত হবে এবং এই বিভাজনের ফলে উৎপন্ন হবে প্রভূত শক্তি।

আরও দেখা গেছে, অপরাপর মৌলের পরমাণুকে ভাঙ্গলে যে পরিমাণ শক্তি নির্গত হয় ইউরেনিয়াম-২৩৫কে ভাঙ্গলে তার চেয়ে প্রায় দশগুণ শক্তি নির্গত হয়। আর শৃঙ্খল বিক্রিয়া ঘটলে তো কথাই নেই! বিজ্ঞানীদের হিসেব দেখে জানা যায়, শৃঙ্খল বিক্রিয়ার মাধ্যমে এক পাউণ্ড ইউরেনিয়াম-২৩৫ থেকে যে শক্তি লাভ করা যায় সেই শক্তি লাভ করতে হলে কম করে দশ হাজার টন বারুদ পোড়াতে হবে।

ইউরেনিয়ামের ভাঙ্গনে উদ্ভূত এত যে প্রচণ্ড শক্তি—একে গত দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধে নিয়োগ করা হয়েছিল ধ্বংসাত্মক কাজে—তথা পরমাণু বোমা নির্মাণে। ফলে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল জাপানের দুটি সমৃদ্ধ ও জনবহুল শহর—হিরোসিমা ও নাগাসাকিকে। কিন্তু কিছুদিন পরেই ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে ইউরেনিয়াম-২৩৫ এর ভাঙ্গনে উদ্ভূত প্রচণ্ড শক্তিকে মানবকল্যাণে নিয়োগ করেন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী এনরিকো ফার্মি। ইনিই প্রথম সেই প্রচণ্ড তাপশক্তিকে বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত করে এক অক্ষয়কীর্তি স্থাপন করে গেছেন।

পরমাণুর নিউক্লিয়াসকে বিভাজন করে শক্তি লাভ করতে হলে আগে সেই ভাঙ্গনকে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা করতে হয় এবং সেই বিভাজন নিষ্পন্ন করা হয় নিউক্লিয়ার রি-অ্যাকটারের মাধ্যমে। এই উদ্দেশ্যে একটি ন্যূনতম আকারের ইউরেনিয়াম-২৩৫ খণ্ড নিতে হয়। বিজ্ঞানের পরিভাষায় ঐ টুকরাটিকে বলা হয় ক্রিটিক্যাল সাইজ। পুরু ইস্পাতের তৈরি প্রকোষ্ঠ বা নিউক্লিয়ার রি-অ্যাকটারের প্রধান বৈশিষ্ট্য এতে থাকে বোরন কারবাইড বা গ্রাফাইট বা ভারী জল প্রভৃতির মত কতকগুলি নিউট্রন নিয়ন্ত্রক বস্তু বা মডারেটার। শৃঙ্খল বিক্রিয়ার মাধ্যমে যত নিউট্রন নির্গত হয় তাদের সবাই বিভাজন ঘটাতে সক্ষম হয় না। নিউট্রন নিয়ন্ত্রক বস্তুর দ্বারা কিছু কিছু নিউট্রন যেমন শোষিত হয়ে যায় তেমনই নিউট্রন মুক্তির হারও কমায়। ফলে মুহূর্তের মধ্যে সমূহ ইউরেনিয়াম-২৩৫ এর পিণ্ডটি বিভাজিত হতে পারে না। প্রয়োজনানুযায়ী বিভাজিত হতে থাকে এবং তাপশক্তি উৎপাদন করে। ঐ তাপশক্তিকে কাজে লাগিয়ে প্রথমে স্টীম তৈরি করা হয়। সেই স্টীম দ্বারা টার্বো-জেনারেটার চালিয়ে উৎপন্ন করা হয় বিদ্যুৎ। এইভাবে নিয়ন্ত্রকের উপস্থিতিতে মাত্র এক পাউণ্ড ইউরেনিয়াম-২৩৫ থেকে এক মেগাওয়াট হারে এক বছর ধরে বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন করা সম্ভব হয়।

ইউরেনিয়াম-২৩৫ কিন্তু সহজলভ্য নয়। তাই কোন কোন দেশ ইউরেনিয়াম-২৩৫ এর পরিবর্তে থোরিয়ামকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করছে। অপরদিকে ইউরেনিয়াম-২৩৫ ছাড়া অন্যান্য বস্তুর পরমাণু থেকে শক্তি

উৎপাদনের জন্য নানা ধরণের রি-অ্যাকটার ব্যবহৃত হচ্ছে। এদের মধ্যে তাপীয় রি-অ্যাকটার, ফাস্ট রি-অ্যাকটার, বীডার রি-অ্যাকটার ও পাওয়ার রি-অ্যাকটার প্রধান।

পরমাণু চুল্লী তথা নিউক্লিয়ার রি-অ্যাকটর অত্যন্ত ভয়াবহ জিনিস। এতে যে তেজস্ক্রিয় বিকীরণ ঘটে তা যাতে বাইরে বেরিয়ে যেতে না পারে তারজন্য বিশেষ বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা হয়। তারজন্য চুল্লীকে বসানো হয় কংক্রিটের পুরু দেওয়ালের ভেতরে। আর ইউরেনিয়াম রডগুলিকে এক একটি খাড়া নলের মধ্যে পুরে রাখা হয় এবং তার বাহিরে আবর্তন করানো হয় শীতল জলকে। ফলে চুল্লীর তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত হয়।

যত সাবধানতা অবলম্বন করা হোক না কেন, তবু বিপদের সম্ভাবনা থেকে যায়। ১৯৮৬ সালের ২৬শে এপ্রিল সোভিয়েত ইউনিয়নের ইউক্রেন প্রদেশে একটি দুর্ঘটনা ঘটেও গেছে। তাই পরমাণু চুল্লী সম্বন্ধে আজ ভাববার দিন এসেছে।

অনেকে মনে করেন, পরমাণু চুল্লী থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচ কম। তার উত্তরে বহু বিজ্ঞানী জানাচ্ছেন, উৎপাদনের খরচ কম হলেও চুল্লী বসানোর প্রাথমিক খরচের অঙ্কটা কিন্তু বিরাট। তার উপর অল্প হলেও তেজস্ক্রিয়া ছড়াচ্ছে। এর প্রভাব জীব ও উদ্ভিদ দেহে অত্যন্ত ক্ষতিকর। এমনকি ক্যানসার পর্যন্তও হতে পারে। তাই এই ভয়াবহ ব্যবস্থাকে বাদ দিয়ে অন্য শক্তিকে বিকল্প হিসাবে গ্রহণ করার অনুসন্ধান চালানো উচিত। মনে হয়, ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎশক্তির চাহিদা মেটাতে বিকল্প হিসাবে সৌরশক্তিকে ব্যবহার করতেই হবে। তবে এই স্তরের গবেষণা এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে বলতে হবে।

সৌরশক্তি—সৌরশক্তিকে মানুষ যে প্রাগৈতিহাসিক যুগে কাজে লাগিয়েছিল, সেকথা আগেই বলা হয়েছে। বর্তমানে কিন্তু বিজ্ঞানীরা এই সৌরশক্তিকে জ্বালানী সাশ্রয়ের কাজে লাগানোর জন্য যেন উঠে পড়ে লেগেছেন। তার কারণ, বর্তমান পৃথিবীতে শক্তির সঙ্কট দেখা দিয়েছে প্রচণ্ডভাবে। একদিকে খনি থেকে কয়লা ও পেট্রোলিয়াম ক্রমাগত উত্তোলনের ফলে প্রকৃতির ভাণ্ডার ধীরে ধীরে নিঃশেষ হয়ে আসছে। অপরদিকে তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থের পরিমাণও পৃথিবীতে নিতান্তই কম। তেল ও কয়লার বিকল্প হিসাবে ইউরেনিয়াম প্রভৃতি তেজস্ক্রিয় পদার্থের পরমাণুকে কাজে লাগিয়ে যে প্রভূত শক্তি উৎপন্ন করবে—তারও উপায় নেই। তাই মানব-সভ্যতার অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখতে মানুষের দৃষ্টি পড়েছে সূর্যালোকের দিকে।

সাধারণত সূর্যরশ্মিকে বড় বড় লেন্সের সাহায্যে কেন্দ্রীভূত করে এবং ঐ রশ্মিকে কাজে লাগিয়ে সৌর উনান প্রভৃতি অনেক কিছুই তৈরি করা হচ্ছে। এর ফলে রান্না করা, বয়লারে জল গরম করা, শীতের দিনে বাসগৃহকে গরম করা, ইত্যাদি ক্ষেত্রে যথেষ্ট সফলতা এসেছে। পদ্ধতিগুলি ব্যাপকভাবে ব্যবহারেরও চেষ্টা চলছে। তবে খরচ বেশী পড়ায় এবং কিছু কিছু অসুবিধা থাকায় পদ্ধতিগুলি এখনও জনপ্রিয় হতে পারছে না।

অপরদিকে সৌরশক্তি থেকে সরাসরি যন্ত্রের সাহায্যে বিদ্যুৎও তৈরি করা হচ্ছে, এই উপায়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে হলে দরকার হয় এক ধরণের সেল বা কোষ। ঐ সেলকে বলা হয় ফটো ভোল্টাইক সেল। সংক্ষেপে সৌর-কোষও বলা হয়। বিশুদ্ধ সেমিকন্ডাকটার সিলিকনের উপর বিশেষ প্রক্রিয়ার সাহায্যে আর্সেনিক ও বোরন নামক দুটি মৌলের স্তর সৃষ্টি করলেই তৈরি হয় এই সেল। কিন্তু একটিমাত্র সেল থেকে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ পাওয়া যায় তা অতি নগণ্য। সেই কারণে বহুসংখ্যক সেল একত্রিত করে তবেই তার উপর সূর্যরশ্মিকে লেন্সের সাহায্যে কেন্দ্রীভূত করা হয়। ফলে আপনা হতেই পাওয়া যায় প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ। অদূর ভবিষ্যতে এই পদ্ধতিটির প্রচলন ব্যাপকভাবে শুরু হয়ে যাবে।

পরিশেষে উল্লেখ করতে হয় যে, পৃথিবীর যে কোন শক্তির মূল উৎসই হচ্ছে সূর্য। কয়লা, পেট্রোলিয়াম ও কাঠ থেকে যে শক্তি লাভ করি এবং যে জলশক্তিকে ব্যবহার করি, এদের সবার মূলে সূর্যের শক্তি। তবে এগুলিকে সূর্যের পরোক্ষ শক্তি বলাই যুক্তিসঙ্গত। কেননা কয়লা, কাঠ ও পেট্রোলিয়ামের উৎস গাছপালা ও জীবজন্তু। এরা সূর্যকিরণ লাভ করেই পুষ্ট হয়েছিল। তারপর মাটি চাপা পড়ে রূপান্তরিত হয়েছে কয়লা ও পেট্রোলিয়ামে। পৃথিবীর বারিমণ্ডলের জল সূর্যকিরণে বাষ্পীভূত হয়েই একদিন বৃষ্টিরূপে ফিরে আসে এবং নদীর জলস্ফীতি ঘটে। তাই নদীর জলও সূর্যের পরোক্ষ শক্তি। সূর্যের প্রত্যক্ষ শক্তি তথা সূর্যকিরণকে সরাসরি ব্যবহার করে শক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা একেবারে আধুনিক বলা যেতে পারে।

উনানের আলো থেকে বিদ্যুতের আলো

আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ হাজার বছর আগে মধ্যপ্রস্তর যুগে মানুষ আগুন জ্বালাতে শিখেছিল। কিন্তু কেমন করে যে প্রথম তারা আগুন জ্বালিয়েছিল সে তথ্য অনেকটা অজ্ঞাতই থেকে গেছে। শুধু কতকগুলি অনুমান খাড়া করা হয়েছে মাত্র। একদলের মতে মানুষ বাজপড়া গাছ থেকে আগুন সংগ্রহ করেছিল, আর এক দলের মতে পাথর ঠুকতে গিয়েই সন্ধান পেয়েছিল আগুনের। তবে যেমন করে অগ্নি প্রজ্জলিত হোক না কেন প্রথম অগ্নিদেবতাকে বন্দী করা মানবসভ্যতার ইতিহাসে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সেদিন উনানে কাঠ পুড়িয়েই অগ্নিশিখাকে উৎপন্ন করতো মানুষ এবং জ্বলন্তকাঠ তাদের অন্ধকারে পথ চেনাতো, বন্যজন্তুকে তাড়াতো, গুহাকক্ষকে গরম ও আলোকিত করতো। পরের দিকে পশুমাংসকে কাঁচা না খেয়ে ঐ আগুনেই ঝলসে নিতো।

এমনই করে চলে আসছিল কত শত শত বছর। একদিন মানুষ আবিষ্কার করলো, এক ধরণের আঠাযুক্ত পাইন কাঠ আলো জ্বালাবার পক্ষে খুবই উপযুক্ত। শিখা বেশ বড় হয় এবং অধিকক্ষণ জ্বলতে থাকে। সেই থেকে অন্ধকারকে ছিন্নভিন্ন করতে পাইনের ডাল অথবা পাইন কাঠের ফালিই হলো একমাত্র সহায়। রাতবিরেতে কোথাও যেতে হলে অথবা কাজ করতে হলে একখানা পাইন কাঠকে জ্বেলে সামনে ধরতো। হাতে টর্চ নিয়ে আমরা যেমন চলি, ঠিক যেন তেমনটি।

আরও পরে অগ্নিশিখা উৎপাদন করতে ব্যবহার করলো প্যাপিরাসের টুকরো। এও আদিম মানুষের অনুসন্ধানের ফল। পাইন কাঠ সবসময় সহজলভ্য না হওয়ায় বিকল্প হিসাবে প্যাপিরাসের টুকরোগুলোকে দড়ির মত পাকিয়ে মোটা সলতের মত করেছিল। বলা বাহুল্য, পাইন কাঠ অপেক্ষা প্যাপিরাসের সলতে থেকে আরও বেশী আলো পাওয়া গেল এবং হালকা হওয়ায় ব্যবহার করাও বেশ সহজ ছিল।

প্রথম অগ্নিশিখা উৎপাদনের জন্য প্রদীপ নির্মিত হয়েছিল মিশরে। এটিকেও একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার রূপে গণ্য করা যেতে পারে। কে যে প্রথম উদ্ভিজ্জ তেলে বা চর্বিতে সলতে ভিজিয়ে আগুনে ধরে শিখা উৎপাদন করেছিল তা কারুর জানা নেই, তবে ঐ পদ্ধতিই চলে এসেছিল সহস্র সহস্র বছর। এমনকি এখনও প্রদীপের ও লণ্ঠনের যুগ শেষ হয়নি।

সেদিন মিশরীয়রা মাটির ও পাথরের উভয় ধরণের প্রদীপ ব্যবহার করতো। সলিতা পাকাতো প্যাপিরাস অথবা তুলার আঁশের সাহায্যে। পরবর্তীকালে গ্রীক ও রোমানদের হাতে পড়ে এই প্রদীপ আরও উন্নত হয়। তারা তৈরি করতো নানা ধরণের প্রদীপ ও ল্যাম্প। তবে সর্বক্ষেত্রেই ইন্ধন হিসাবে ব্যবহার করতো উদ্ভিজ্জ তেলকে। সত্য কথা বলতে কি, কেরোসিন তেল আবিষ্কারের পূর্ব পর্যন্ত ঐ একই ধরণের ব্যবস্থা চলে আসছিল। এই সেদিনও পর্যন্ত আমাদের দেশে রেড়ি, নিম প্রভৃতির বীজকে ঘানিতে পিষে তেল বার করা হতো এবং ঐ তেল দিয়ে প্রদীপ, মশাল প্রভৃতি জ্বালোতো।

উদ্ভিজ্জ তেল ব্যবহারের পূর্বে মনে হয় মানুষ চর্বিকে জ্বালিয়েছিল। চর্বি-ওয়ালা মাছ, মাংস ইত্যাদিকে আগুনে ঝলসাতে গিয়ে টের পেয়েছিল চর্বির অগ্নিশিখা উৎপাদনের ক্ষমতা। আর তখনই হয়ত পাথরের বাটিতে চর্বি রেখে এবং তাতে সলতে পুঁতে শিখা উৎপাদন করতে চেয়েছিল। অবশ্য এখনও উক্ত পদ্ধতিটি এস্কিমোরা গ্রহণ করে আসছে।

চর্বির একটা বৈশিষ্ট্য, ঠাণ্ডায় জমে যায় এবং গরমে গলতে শুরু করে। তাই কোন একদিন কোন এক বুদ্ধিমান হয়ত বা সলতের চারপাশে চর্বি জমিয়ে তৈরি করে নিয়েছিল একধরণের বাতি—যা আজকের মোমবাতির আদিরূপ বলা যায়। পরের দিকে দুর্গন্ধযুক্ত চর্বির পরিবর্তে মানুষ মোমকে ব্যবহার করে-ছিল। অবশেষে প্যারাফিন সুলভ হওয়ায় মোমের স্থান দখল করে প্যারাফিন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত অগ্নিশিখা উৎপাদনের একমাত্র মাধ্যম ছিল উদ্ভিজ্জ তেল, চর্বি ও মোম। শুধু প্রদীপেরই বৈচিত্র্য এসেছিল। শিল্পীরা চমৎকার করে সাজিয়েছিল এবং সহজে বহনযোগ্য করে তোলার ব্যবস্থা করেছিল। তাছাড়া বাতাসে যাতে নিভে যেতে না পারে তারজন্য প্রদীপ বা ল্যাম্পের চারপাশে কাচের আবরণ পরিয়ে তৈরি করেছিল নানান ধরণের লণ্ঠন।

প্রদীপ বা লণ্ঠনের আলো যথেষ্ট ম্লান। কোন সূক্ষ্মকাজ সেই আলোতে সম্ভব নয়। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বেশী আলোর ব্যবস্থা করতে হলে একসঙ্গে অনেকগুলো বড় বড় মোমবাতি জ্বালাতে হতো অথবা কোন বড় ভাঁড়ে প্রচুর তেল রেখে মোটা সলতের ব্যবস্থা করতে হতো।

১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা। তখন খনি থেকে প্রচুর পরিমাণে কয়লা উত্তোলিত হচ্ছে। ব্যবহার করা হচ্ছে ধাতু নিষ্কাশনে, জ্বালানী হিসাবে এবং ইঞ্জিনে। উইলিয়ম মার্ডক (যিনি গাড়ী তৈরি করেছিলেন) একদিন চিন্তা করলেন, কয়লা পোড়ালে যে গ্যাসটা পাওয়া যায় তাকে জ্বালালে অবশ্যই জ্বলতে পারে।

মার্ডক শুরু করেছিলেন পরীক্ষা। একদিন একটা বড় লোহার কেটলিতে কয়লা রেখে বেশ ভালভাবে উত্তপ্ত করলেন। কেটলির মুখটা বন্ধ ছিল। তবে ভেতরের গ্যাসটা বেরিয়ে আসার জন্য ছিল মাত্র একটা সরু নল। নল দিয়ে যখনই ভুস ভুস করে ধোঁয়া বার হতে লাগলো তখনই মার্ডক সেই গ্যাসে ধরলেন অগ্নিশিখা। সঙ্গে সঙ্গে গ্যাস দপ করে জ্বলে উঠে উজ্জ্বল আলোক শিখা বিতরণ করতে শুরু করে দিল।

মার্ডকের উৎসাহে ও চেষ্টায় সেদিন থেকে গ্যাস-আলোর প্রচলন শুরু হলো। তিনি নিজেই একদিন বার্মিংহাম শহরটাকে গ্যাসের আলোয় আলোকিত করেছিলেন। পরের দিকে ইওরোপের প্রায় অধিকাংশ শহর লুফে নিয়েছিল মার্ডকের আবিষ্কারকে। ধনী ব্যক্তিরা আবার ব্যক্তিগতভাবে বাসগৃহকে আলোকিত করেছিলেন ঐ গ্যাসের আলোকে।

বাসগৃহকে আলোকিত করণের জন্য গ্যাসের আলোর পাশাপাশি কেরোসিন বাতিরও প্রচলন শুরু হয়েছিল সেই সময়। এটি সম্ভব হয়েছিল কলোনেল ড্রেক কর্তৃক খনিজ তেল আবিষ্কারের পরে। একই সঙ্গে কেরোসিন লণ্ঠনের উন্নতি সাধিত হয় এবং আবিষ্কৃত হতে থাকে হ্যাজাক প্রভৃতি লণ্ঠন। যে-সব জায়গায় এখনও বিদ্যুৎ যায়নি সে-সব জায়গায় এখনও ব্যবহার করা হচ্ছে সেই সব লণ্ঠন।

গ্যাসের আলোর পরে শুরু হয়েছে বিদ্যুতের যুগ। আর ঐ বিদ্যুৎকে করায়ত্ত করতেই মানবসভ্যতার চেহারাটা যেন আমূলভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। বিদ্যুৎ নিয়ে যাঁরা গবেষণা করতেন তাঁরা একদিন বুঝতে পারলেন, কোন ধাতব সরু তারের মাধ্যমে বিদ্যুৎকে প্রবাহিত করলে ধাতব তারটি উত্তপ্ত হয়ে উঠে। অথচ খুব উত্তপ্ত হলেও আলো জ্বলে না। তখনই কেউ কেউ সচেষ্ট হলেন বিদ্যুতের দ্বারা আলো জ্বালাতে।

প্রথম ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যুতের সাহায্যে আলো জ্বালাতে চেষ্টা করেন হামফ্রে ডেভি। তিনি ব্যাটারির উভয় প্রান্তে দুটি কারবন দণ্ড যুক্ত করে দণ্ড দুটিকে কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর স্পর্শ ও বিচ্ছিন্ন করিয়েছিলেন। ফলে লক্ষ্য করেছিলেন আলোর ঝলকানি। ঐ ঘটনা থেকে তড়িৎবিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় একদিন আবিষ্কৃত হয় আর্কল্যাম্প।

আর্কল্যাম্পের পরবর্তী ধাপ বৈদ্যুতিক বাতি। একটি কাচের বাল্বের ভেতরে কারবনের সরু তার বা ফিলামেণ্ট যুক্ত করার পর বাল্বকে বায়ুশূন্য করে এবং বাহির থেকে তারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ পাঠাতে গিয়ে উজ্জ্বল আলো বিতরণ করেছিল

ফিলামেণ্ট। ব্যাপারটা ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে একই সময়ে আবিষ্কার করেছিলেন টমাস আলভা এডিসন এবং জোসেফ উইলসন স্বোয়ান। তাই সেদিনের সেই বৈদ্যুতিক বাতির নামকরণ হয়েছিল এডি-স্বোয়ান ল্যাম্প।

এডিসন, স্বোয়ান এবং অন্যান্য যাঁরা বিদ্যুৎ নিয়ে গবেষণা করতেন তাঁরা লক্ষ্য করেছিলেন, যাদের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ চলাচল করতে পারে তথা পরিবাহীর যে কোনটির দ্বারা সূক্ষ্ম তার বা ফিলামেণ্ট তৈরি করলে এবং ফিলামেণ্টের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ পাঠালে আলো পাওয়া যায় না। অধিক উষ্ণতায় ফিলামেণ্ট পুড়ে ছাই হয়ে যায়। একমাত্র ব্যাতিক্রম ছিল কারবন ফিলামেণ্ট। কিন্তু কারবন ফিলামেণ্টের কিছু কিছু ত্রুটি থাকায় বিজ্ঞানীরা অপর কোন ফিলামেণ্টের খোঁজ করতে থাকেন এবং লাভ করেন টাংস্টেনকে।

বর্তমানে বাল্বের ভেতরে টাংস্টেনের সূক্ষ্ম তন্তু বা ফিলামেণ্ট যুক্ত করার পর বাল্বকে বায়ুশূন্য করা হয়। বহুক্ষেত্রে বায়ুহীন বাল্বের ভেতরে আর্গন নামক গ্যাসটিকে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। ফলে ফিলামেণ্ট দীর্ঘস্থায়ী হয়। আর সেই ফিলামেণ্টের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎকে প্রবাহিত করলে একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রার ঊর্ধ্বে ফিলামেণ্টটি ভাস্বর হয়ে আলো বিকিরণ করতে থাকে।

আজকাল বৈদ্যুতিক বাতির অনেক উন্নতি হয়েছে। কম বিদ্যুৎ খরচ করে যাতে বেশী তথা উজ্জ্বল আলো লাভ করা যায় তারজন্য বাল্বের ভেতরে প্রতিপ্রভ বস্তুর প্রলেপ দেওয়া হয়। এর ফলে অদৃশ্য অতিবেগুনী রশ্মিও দৃশ্যমান হয়ে উঠে। সাধারণত বাল্বের ভেতরের দেওয়ালে পারদ নামক ধাতুটির প্রলেপ দিয়ে তৈরি করা হয় প্রতিপ্রভ বাতি।

এখন আবার গোলাকার বৈদ্যুতিক বাতির পরিবর্তে টিউব বাতির প্রচলন ধীরে ধীরে বেড়ে চলেছে। কারণ ওর ভেতরের দেওয়ালে পারদের প্রলেপ থাকার জন্য এরা প্রতিপ্রভ বাতি এবং বিদ্যুতের খরচও কম হয়। যদিও মূল্য গোলাকার বাল্ব অপেক্ষা বেশী। টিউব বাতির আর একটা সুবিধা এই যে, এতে ছায়া প্রায় থাকে না বললেও চলে। উক্ত কারণদ্বয়ের জন্য টিউববাতির ব্যবহার দিনে দিনে বেড়ে চলেছে। আজকলে রাস্তা আলোকিতকরণে যে সব টিউববাতি ব্যবহার করা হয়, তাতে পারদ অথবা সোডিয়াম বাষ্পের প্রলেপ থাকে।

বিজ্ঞাপনের জন্য উজ্জ্বল ও রঙবেরঙের আলোকসৃষ্টিতে অথবা আলোকসজ্জায় বাতির ভেতরে নিয়ন প্রভৃতি কয়েক ধরণের নিষ্ক্রিয় গ্যাসকে প্রবেশ করানো হয়ে থাকে। কোন কোন সরু সরু নিয়নটিউবও ব্যবহার করা হয়। নিয়নের আলো অতি উজ্জ্বল ও লালবর্ণের। নিয়ন, আর্গন ও পারদবাষ্প একত্রে মিশিয়ে বাতিতে

পুরলে ফিকে নীল আলোক লাভ করা যায়। আর পারদবাষ্পের সঙ্গে কেবলমাত্র নিয়ন গ্যাসকে মিশিয়ে বাতিতে পুরলে পাওয়া যায় সবুজ অথবা নীল আলোক। নিয়ন আলো এত উজ্জ্বল যে গাঢ় কুয়াশার ভেতর দিয়েও দেখতে কোন অসুবিধা হয় না। তাই পাইলটদের আলোর সঙ্কেত দেখাতে নিয়ন আলোই ব্যবহার করা হয়।

সবচেয়ে তীব্র আলো উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হয় লাইট হাউসে বা আলোকস্তম্ভে। আলোকস্তম্ভ স্থাপন করা হয় সমুদ্রে দূরাগত জাহাজকে সঙ্কেত জানাতে। এতে ব্যবহার করা হয় দশ-বার হাজার ওয়াট ক্ষমতাযুক্ত অতি শক্তিশালী টাংস্টেন ফিলামেণ্টের বাতি। ঐ বাতিকে ঘিরে থাকে আবার কতকগুলি লেন্স এবং লেন্সগুলিকে একটি ধাতব কাঠামোর গায়ে দৃঢ়ভাবে সজ্জিত করা থাকে। এর ফলে বাতি থেকে নির্গত আলোকরশ্মিগুলিকে লেন্সের দ্বারা একত্রিত করে একটা নির্দিষ্ট দিকে চালনা করা হয়। লেন্সের কাঠামোটি অত্যন্ত ভারী এবং ওকে একটি পারদপূর্ণ আধারে ভাসমান অবস্থায় রাখা হয়। বৈদ্যুতিক মোটরের সাহায্যে কাঠামোটিকে ঘোরাবার ব্যবস্থা থাকে। ফলে কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর তীব্র আলোর ঝলকানি ছড়িয়ে দেয়।

পশুচর্ম থেকে কাপড়

মানুষ এককালে উলঙ্গ অবস্থাতেই কাল কাটাতো। সহস্র সহস্র বছর ধরে লজ্জা নিবারণের কথা তাদের মনেই আসেনি এবং প্রয়োজনও অনুভব করেনি। তবে আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ হাজার বা তারও কিছু আগে পৃথিবীর পরিবেশটা ভয়ঙ্কর শীতল হয়ে ওঠায় শীতের প্রকোপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য একসময় বুদ্ধি করে গায়ে পশুচর্ম জড়িয়েছিল।

পৃথিবীর বুকে একটানা প্রায় পঁচিশ হাজার বছর ধরে প্রবাহিত হয়েছিল প্রচণ্ড শৈত্যপ্রবাহ, তারপর ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে হতে একদিন সূচনা হয় মনোরম পরিবেশের। তখন মানুষ গ্রীষ্মের মধ্যেও দীর্ঘকালের অভ্যাসকে পরিবর্তন করতে পারলো না। পরন্তু মানসিকতার যথেষ্ট পরিবর্তন আসায় সেই পশুচর্মকেই লজ্জা নিবারণের উপায় হিসাবে গ্রহণ করলো। তবে পূর্বের মত চামড়াকে যেমন-তেমন ভাবে গায়ে জড়ালোনা, কেটে ফালি ফালি করে এবং সূচ দিয়ে সেলাই করে দস্তুরমত পোষাক বানালো। সেই পোষাক বলতে কটিদেশ থেকে হাঁটু পর্যন্ত বিস্তৃত ঢিলে একটা আচ্ছাদন। কাঁধ থেকে একটি ফিতে সামনে ও পেছনে চামড়াটার সঙ্গে সেলাই করে দেওয়ায় অথবা ফিতের কোমরবন্ধের ব্যবস্থা করায় কোমরে আটকে থাকতো চামড়াটা। একই পোষাক ছিল স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই। কিরাতবেশী হরগৌরীর ছবি যেমন—অনেকটা তেমনই ছিল আদিকালে মানুষের পোষাক।

মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির প্রসার ঘটলো, কিছুটা আরামপ্রিয় হয়ে উঠলো এবং জনসংখ্যাও বেড়ে চললো। তখন অঙ্গাবরণের ক্ষেত্রে পশুচর্মে যেমন মন ভরলো না, তেমনই এত পশুচর্ম সংগ্রহ করাও কষ্টসাধ্য হয়ে উঠলো। লজ্জা-নিবারণ ও শরীর রক্ষায় পশুচর্মের বিকল্প অনুসন্ধান করতে প্রবৃত্ত হলো। আর তখনই তাদের কারও কারও দৃষ্টি পড়লো লম্বা লম্বা ঘাস এবং কিছু কিছু গাছের ছালের দিকে।

আজকের মত সেদিনও এখানে সেখানে পাটজাতীয় গাছ বছরের বিশেষ বিশেষ সময়ে জন্মাতো। তাদের ছাল পচে গেলে যে সুন্দর সুন্দর তন্তু পাওয়া যায়—তাও তাদের জানা ছিল অনেক আগে থেকে। ঐ তন্তু দিয়েই তারা পশুচর্মকে সেলাই করে পরিধেয়ের উপযোগী করতো। তন্তুগুলোকে পাক দিয়ে যে দড়ি তৈরি করতো তাই দিয়েই প্রথম শুরু করে কাপড় বুনতে। মনে হয়,

প্রথমে তারা কাঠের চৌকো ফ্রেম বেঁধে এবং তাতে দড়ির টানা বেঁধে হাতে বুনন দিয়েই তৈরি করেছিল কাপড়। সে কাপড় সাধারণভাবে কোমরে জড়াবার মত ব্যবস্থা। দৈর্ঘ্যে প্রস্থে আগেকার পরিধেয় সেই পশু চামড়ার মত ছিল। মিহিও ছিল না, তবে চামড়া অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিল।

অপরদিকে পাটজাতীয় গাছের তন্তু তত সহজলভ্য ছিল না, যতখানি সহজ লভ্য ছিল নদীর তীরভূমিতে কুশজাতীয় সরু ও লম্বা লম্বা তৃণ। কাঠের ফ্রেমে অথবা মাটিতে পেতে বুনন দিয়ে দিয়েও কোমরের মাপের আচ্ছাদন তৈরি করতো। আজকের কুশাসনের মতই ছিল সেদিনের বস্ত্র।

অত্যন্ত সহজ মনে হলেও পদ্ধতিগুলি কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। যে শিল্পীর মাথায় প্রথম এইসব পদ্ধতির উদয় হয়েছিল তাঁর তুল্য কারিগর জগতে বিরল বললেও ভুল হবে না এবং তাঁর অবদানেরও কোন তুলনা হয় না।

এর পরের ধাপ সূতা তৈরির উপায় উদ্ভাবন। বনে বনে সেদিনও যথেষ্ট তুলার গাছ জন্মাতো। ফল পেকে আপনা হতে ফলের ঢুলিটা ফেটে যেতো এবং তুলা ছড়িয়ে পড়তো বনময়। অনুসন্ধিৎসু মানুষ সেগুলি পরীক্ষা করে দেখতো, কাজে লাগানোর কথা চিন্তা করতো, আঁশগুলোকে হাতে পাক দেওয়ারও হয়ত চেষ্টা করতো। পরিশেষে সুন্দর, মোলায়েম ও ধবধবে সাদা আঁশগুলো দিয়ে সূতো তৈরি করেছিল এবং কাপড়ও বুনেছিল।

অতি প্রাচীনকালে সেই মিশরীয় সভ্যতার আদিপর্বে সূতো পাকানো হতো তকলির সাহায্যে। গোলাকার পাথরের চাকতির মাঝখানে ছিদ্র করে একটা সরু দণ্ড পরিয়ে দিতো। তারপর পর্যাপ্ত সূতা কাটা হলে পূর্বের মত হাতেই কাপড় বুনতো। কোন তাঁত সেদিন আবিষ্কৃত হয়নি। তাই একখানা কাপড় বুনতে বেশ সময় লাগতো। হয়ত এই কারণে কাপড় বোনা সহজ না হওয়ায় একমাত্র ধনী ও রাজরাজড়ারা একটু বেশী পরিমাণে কাপড় ব্যবহার করতেন। সাধারণ মানুষ কোমরে জড়ানোর মত নিতান্ত ছোট কাপড় অথবা দড়ির কাপড় অথবা সাবেক আমলের পশুচর্মকেই ব্যবহার করতো। তার প্রমাণ, সেকালে প্যাপিরাসের উপর আঁকা মিশরীয়দের ছবি। রাজা-রানী কিংবা দেবদেবীদের গায়ে বহুমূল্য অলঙ্কার আছে সত্য কিন্তু কাপড় হাঁটুর উপরে।

পরবর্তীকালে বিভিন্ন সভ্যদেশ ব্যাপকভাবে তুলার চাষ আরম্ভ করে। মিশরে ও ভারতে ভাল তুলা উৎপন্ন হতো। তাই সূতীবস্ত্র বয়নে এইসব দেশ উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিল। হাতে বোনা তাঁতও এইসময় আবিষ্কৃত হয়েছিল এবং মনে হয় তকলি দিয়ে ও স্পিনিং হুইলে—উভয় প্রকারে সূতো-

কাটার পদ্ধতির প্রচলন হয়েছিল।

সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগেও ভেড়ার লোম দিয়ে শীতবস্ত্র নির্মাণের পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছিল। ভারত, চীন প্রভৃতি দেশে রেশমকীট চাষেরও প্রচলন হয়েছিল। গ্রীকদের আমলে এবং রোমান আমলে ভারতে উৎকৃষ্ট সূতী ও রেশমী বস্ত্র যে তৈরি হতো তার বহু প্রমাণ আছে। সে আসলে পাশ্চাত্য কিন্তু বস্ত্রবয়নে তেমন অগ্রসর ছিল না।

অষ্টাদশ শতাব্দীর একরকম শেষ ভাগ পর্যন্তও চলে আসছিল সেই প্রাচীন রীতি। সূতাকাটা কিংবা বস্ত্রবয়নের জন্য যান্ত্রিক সরঞ্জাম বিশেষ ছিল না। শুধু কারিগরদের দক্ষতার গুণেই ভাল ভাল সূতী ও রেশমী বস্ত্র বয়ন হতো। যান্ত্রিক সরঞ্জামের উদ্ভব হয় প্রথম ইংলণ্ডে। কথিত আছে, হস্তচালিত তাঁতের উন্নতি সাধন করেছিলেন "জন কে" নামে ইংলণ্ডের একজন তাঁত-চালক। সেই প্রথম তাঁতকে যন্ত্রের দ্বারা চালিয়ে কয়েকজনের কাজ একাই সম্পন্ন করেন 'জন কে'। ফলে অল্পদিনেই তাঁর তাঁত জনপ্রিয় হয়ে উঠে। অপরদিকে সূতার চাহিদা মেটাতে গিয়ে আর্করাইট আবিষ্কার করেন এক নতুন পদ্ধতি। ওতে একজন একসঙ্গে পাঁচ-সাত গাছা সূতা কাটতে পারতেন। সেই থেকে যন্ত্রের সাহায্য নিয়ে সূতা-কাটা ও বস্ত্রবয়নে আরও নতুন নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবন হয় এবং অচিরে ইংলণ্ডে বস্ত্র-শিল্পে বিপ্লব সূচিত হয়।

কেবল সূতীবস্ত্র নয়, পশম শিল্পে ও রেশম শিল্পেও অভাবনীয় উন্নতি হতে শুরু করে। ভেড়ার লোমকে কাঁচি দিয়ে কাটবার প্রয়োজন হলো না, বিদ্যুৎচালিত মেশিনের দ্বারাই সংগ্রহ হলো। পশম থেকে সূতা তৈরি ও বস্ত্রবয়নেরও নতুন নতুন পথ খুলে গেল। অপরদিকে গুটি পোকার চাষ, গুটি থেকে রেশম সংগ্রহ, সূতা পাকানো এবং কাপড় বোনা, সর্বক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হলো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি।

মাত্র একশ বছরের মধ্যেই জনসংখ্যা বাড়া সত্ত্বেও মানুষের বস্ত্রসঙ্কট দূরীভূত হলো; বিভিন্ন ধরণের টেকসই সূতী, রেশমী ও পশমী বস্ত্র তৈরি হওয়ায় নতুন ধরণের পোষাক পরিচ্ছদেরও প্রবর্তন হলো। এখন আবার সূতী ও রেশমী বস্ত্রের পরিবর্তে রেয়ন বা কৃত্রিম রেশম, টেরিলিন ও নাইলনের প্রচলন ধীরে ধীরে বেড়ে চলেছে। এদের তৈরি করার জন্য তুলো কিংবা গুটিপোকার চাষ করতে হয় না। সাধারণত লেবোরেটারিতেই উৎপন্ন করা যায় এবং একমাত্র রেয়ন ছাড়া অপর সব কৃত্রিম তন্তুকে সম্পূর্ণ অজৈব উপাদান থেকে তৈরি করা হয়।

রেয়ন বা কৃত্রিম রেশমের উপাদান জৈব পদার্থ। কাঠ, বাঁশ, তুলা, পাট

প্রভৃতি যেসব পদার্থে সেলুলোজ থাকে রেয়ন তৈরির কাঁচামাল হিসাবে তাদেরই গ্রহণ করা হয়। প্রথমে বিশেষ বিশেষ প্রক্রিয়ার সাহায্যে কাঁচামাল থেকে বিশুদ্ধ সেলুলোজ প্রস্তুত করতে হয়। পরে সেই সেলুলোজকে শুকিয়ে এবং ভালভাবে গুঁড়া করে প্রথমে কারবন-ডাই-সালফাইড ও পরে জল মিশিয়ে তৈরি করা হয় ভিসকোজ নামক একটি নরম পদার্থ। এবার তলায় সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট একটি ধাতব নলের মধ্যে পুরে উপর থেকে চাপ দিলে ছিদ্রের মাপের সূক্ষ্ম তন্তুতে পরিণত হয়। সেই তন্তুকে শক্ত করা হয় পাতলা সালফিউরিক অ্যাসিডের মধ্যে ডুবিয়ে।

অপর কৃত্রিম তন্তু টেরিলিন ও নাইলন তৈরির জন্য বাঁশ, কাঠ ইত্যাদি জৈব উপাদানের প্রয়োজন হয় না। টেরিলিন তৈরি হয় ইথিলিন টেরিপথ্যালেট নামক একটি এস্টার থেকে। এই এস্টারটিকে আবার তৈরি করা হয় টেরে:-পথ্যালিক অ্যাসিড ও ইথিলিন গ্লাইকলের বিক্রিয়ায়। তরল অবস্থায় পূর্বের সেই রেয়নের মতই সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম ছিদ্রের মাধ্যমে পাঠিয়ে এবং পাতালা সালফিউরিক অ্যাসিডে নিমজ্জিত করে তৈরি করা হয় টেরিলিন তন্তু।

নাইলনকে তৈরি করা হয় অ্যাডিপিক অ্যাসিড ও হেক্সামেথিলিন ডাই অ্যামাইন নামক দুটি পদার্থকে উচ্চতাপে বিক্রিয়া ঘটিয়ে।

আজকের দিনে কৃত্রিম তন্তুর ব্যবহার ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। তূলা চাষের জন্য প্রচুর জমির প্রয়োজন হয়, রেশম তৈরির জন্য গুটি পোকার চাষ করতে হয়। কিন্তু কৃত্রিম তন্তুর ক্ষেত্রে এসবের কোন ঝামেলা নেই। অপরদিকে এরা শক্ত, টেকসই ও রেশমের মত বেশ চিক্কণ। কেবলমাত্র বস্ত্র শিল্পে নয়, অন্যান্য যে-সব প্রয়োজনে সূতার প্রয়োজন হয় সেখানেও নাইলন বহুল পরিমাণে ব্যবহার করা হচ্ছে।

পাথর থেকে ধাতু

তোমরা তোমাদের আশেপাশে কতই-না ধাতব জিনিসকে দেখতে পাও। ঘরের থালা, বাটি, গেলাস থেকে আরম্ভ করে দরকারী ও নিত্যব্যবহার্য অধিকাংশ জিনিসই ধাতু দিয়ে তৈরি। শুধু কি ঘরের জিনিস! মেসিনপত্র, যানবাহনের ইঞ্জিন ও কাঠামো, বাড়ীঘর তৈরির সাজসরঞ্জাম, টেলিগ্রাফ-টেলিফোন-বিজলী-তার, কত রকমের মোড়ক ও কৌটা, মুদ্রা, গয়না প্রভৃতি প্রায় সব জায়গাতেই ডাক পড়ে কোন-না-কোন ধাতুর। এমন কোন ঘর নেই, এমন কোন কারখানা নেই এবং এমন কোন যানবাহন নেই যেখানে ধাতুর দরকার হয় না। প্রকৃতপক্ষে ধাতুর ব্যবহার করতে শিখেই মানুষ তার সভ্যতার চেহারাটাকে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত করে ফেলেছে।

নিশ্চয়ই তোমরা ভাবছো, এমন যে দরকারী জিনিসগুলো—এদের মানুষ কেমন করে কাজে লাগাতে শিখেছিল এবং এত ধাতুর পরিচয়ই বা পেলে কেমন করে। আর এত ধাতু—যারা সারা পৃথিবীকে একরকম ঢেকে ফেলেছে, তাদের পাওয়া যায়ই বা কোথা থেকে?

এসবের উত্তর পেতে হলে তোমাদের ফিরে তাকাতে হবে অনেক-অনেক পেছনের দিকে—যে-কালের ইতিহাস বড় একটা জানা নেই, যে-কালে মানুষে ও পশুতে বড় একটা তফাৎ ছিল না—সেইকালে, আজ থেকে প্রায় দেড় লক্ষ বছরেরও বেশী আগে—সেই অতি পুরাতন প্রস্তরযুগে। সেদিনের মানুষ ছিল বড় অসহায়। হাতের মুঠো তেমন দৃঢ় ছিল না, মুখে ভাষা ছিল না, দলবেঁধে বাস করতেও পারত না। নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে একদিন আলতোভাবে হাতে তুলে নিয়েছিল ভারী পাথরের টুকরাকে।

কতকাল ঐ পাথরের টুকরো ছিল মানুষের একমাত্র সম্পদ—জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বন ও আত্মরক্ষার উপায়। তাই মানবসভ্যতার আদি পর্বকে পণ্ডিতেরা চিহ্নিত করেছেন প্রস্তরযুগ নামে। প্রায় দেড় লক্ষ বছরের যুগটি শেষ হয়েছে আজ থেকে মাত্র হাজার ছয়েক বছর আগে।

শেষের দিকে মানুস বুদ্ধির জোরে এবং মেহনতের জোরে অনেকখানি উন্নতি লাভ করতে সক্ষম হলো। জনসংখ্যা বাড়ায় চাহিদাও বাড়ল। তাছাড়া দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় অনেক আবিষ্কারও হাতে এসেছিল। গুহা ছেড়ে খাদ্যের অন্বেষণে যখন সমতলভূমিতে অবতরণ করেছিল এবং যাযাবরের জীবনযাপন

করতে বাধ্য হয়েছিল তখনও তাদের প্রধান সহায় ছিল পাথরের হাতিয়ার এবং পাথরের তৈরি জিনিসপত্র। তাই সমতলভূমিতে বিচরণ করলেও নিকটস্থ পাহাড় থেকে বহে আনতে হতো পাথরকে। বল্লম, কুঠার, করাত, সবই ছিল পাথরের।

সেদিনের মানুষ ছিল অত্যন্ত সাহসী। ভয় শব্দটি তাদের অভিধানে ছিল না। আর বিপদ, মৃত্যু ইত্যাদির কোন তোয়াক্কা রাখত না। গায়ে আবার ছিল অসুরের শক্তি এবং ছিল প্রচণ্ড পরিশ্রমী। সারা স্থলভাগটাকে যেন চষে ফেলতে শুরু করেছিল। তারই প্রত্যক্ষ ফল ধাতু আবিষ্কার।

অনেকের মতে মানুষ প্রথম যে ধাতু দুটির সন্ধান পেয়েছিল সে দুটি হল সোনা ও তামা। কেউ মনে করেন আগে সোনা ও পরে তামা। আবার কারও মতে দুটি প্রায় একই সময়ে লাভ করেছিল। সময়কাল খ্রীষ্টপূর্ব ৮০০০ অব্দ। তবে সে সময় তারা দুটি ধাতুকেই একমাত্র অলঙ্কার ছাড়া অন্য কোন কাজে নিয়োগ করতে পারেনি।

আবিষ্কারের কারণ হিসাবে মত পোষণ করা হয় যে, সে সময় মানুষ খাদ্যের অনুসন্ধানে বনে বনে, নদীর তীরে এবং সাগরের বেলাভূমিতে ঘুরে বেড়াতো। সাগর বেলায়, নদীর তীরে বালুকা রাশিতে, গ্রীষ্মে শুষ্ক নদীগর্ভে অবশ্যই তাদের নজরে এসেছিল পাথরের চেয়ে ভারী অথচ আকারে অতি ক্ষুদ্র অথবা রেণু-রেণু হলদে রঙের অত্যন্ত উজ্জ্বল এক পদার্থকে। সূর্যের কিরণে ঝিকমিক করত সেগুলি। সেদিনের অনুসন্ধিৎসু মানুষ তাদের হাতে নিয়ে পরীক্ষা করেছিল, লক্ষ্য করেছিল বছরের পর বছর পড়ে থাকলেও এতটুকু বিবর্ণ হয় না। সৌখিন মানুষ সেদিন ওকে বাহুতে ও গলায় ঝুলিয়ে রাখতো অলঙ্কার হিসাবে।

সোনার অনেক বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীর প্রায় সব দেশে উক্ত ধাতুটিকে মুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। অতীতে আরও বেশী পাওয়া যেত। এর আপেক্ষিক গুরুত্ব বেশী এবং জল, বাতাস ও অন্যান্য অনেক রাসায়নিক পদার্থের সঙ্গে সহজে ক্রিয়া করে না। সেই কারণে ওর ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হয় না এবং আদি মানবের দৃষ্টি ওর দিকে পতিত হওয়া অসম্ভব ছিল না।

সোনা অতি মূল্যবান ধাতু। প্রকৃতিতে প্রাপ্ত মুক্ত সোনার পরিমাণ এত কম যে, ওর দ্বারা মানুষের চাহিদা মেটানো যায় না। কিছু কিছু কোয়ার্জ জাতীয় শিলাতে এবং কোন কোন খনিজে যৌগ হিসাবে সোনা বর্তমান থাকে। বেশীর ভাগ সোনা নিষ্কাশন করা হয়ে থাকে অরিফেরাস কোয়ার্জ নামক শিলা থেকে।

অতীতে তামাকেও পাওয়া যেত মুক্ত অবস্থায়। তাই একই সময়ে অথবা সোনা খুঁজতে গিয়ে মানুষ তামাকে হস্তগত করেছিল। অথবা এমনও হতে পারে, হাতিয়ার বানাতে পাথর খুঁজতে গিয়ে একদিন লক্ষ্য করেছিল সবুজ রঙের এক ধরণের পাথরকে। এই পাথরে ঘা দিতে গিয়ে দেখেছিল, সাধারণ পাথরের মত এটি ভেঙ্গে যায় না পরন্তু প্রসারিত হয় এবং উপরের ময়লা অপসারিত হয়ে সুন্দর লাল টুকটুকে দেখায়।

প্রথম প্রথম মানুষ তামা দিয়ে হাতিয়ার বানায়নি। সোনার মতই সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য অঙ্গে ধারণ করেছিল অলঙ্কার হিসাবে। এটি কেবলমাত্র কল্পনা নয়, অতি প্রাচীনকালে মানুষের ব্যবহৃত জিনিসপত্র দেখে পণ্ডিতেরা অনুরূপ সিদ্ধান্তে এসেছেন।

তামার হাতিয়ার এবং ঘরগৃহস্থালীর জিনিসপত্র তৈরি করতে অনেক সময় লেগেছিল মানুষের। কারণ, তামাকে গলিয়ে ইচ্ছানুযায়ী রূপ দেওয়ার জন্য যে তাপমাত্রার দরকার তা তারা সৃষ্টি করতে পারেনি। তবে প্রকৃতিতে যে সব মুক্ত তামা তারা লাভ করতো তাকে কেটে এবং চেঁচে-ছুলে হাতিয়ার বানাতে প্রয়াসী হয়ত হয়েছিল। সে হাতিয়ার পাথরের হাতিয়ার অপেক্ষা নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠও ছিল।

প্রকৃতিতে মুক্ত তামার পরিমাণ কিন্তু বেশী ছিল না। যেটুকু ছিল তাকে প্রায় নিঃশেষ করে ফেলতে খুব বেশীদিন সময় লাগেনি। তবে বুঝতে পেরেছিল তামার বৈশিষ্ট্যের কথা। তাই ওকে অন্য কোন আকারে পাওয়া যায় কিনা সে বিষয়ে অনুসন্ধান চালিয়েছিল। বলা বাহুল্য পাথর, মুক্ত তামা, তামার আকরিক প্রভৃতি সবই তাদের কাছে পরিচিত ছিল পাথর নামে।

অনেকে মনে করেন, ম্যালাকাইট নামক তামার একটি উন্নত আকরিক থেকে তামা নিষ্কাশন প্রণালী মানুষ আকস্মিকভাবেই লাভ করেছিল। আকরিকটিকে ভূপৃষ্ঠের কোথাও কোথাও লাভ করা যায়। ম্যালাকাইট আকরিকে সমৃদ্ধ অঞ্চলে ঘর বেঁধে কোনদিন না কোনদিন সেখানে কাঠের আগুন জ্বালিয়ে ছিল অথবা বড় রকমের কোন অগ্নিকাণ্ড ঘটাও অসম্ভব ছিল না। সেদিন অবশ্যই লক্ষ্য করেছিল গনগনে লাল তরল ধাতুকে।

কারও কারও মতে আবার নব্যপ্রস্তর যুগের শেষে মেসোপটেমিয়ার কুমোররা ম্যালাকাইট জাতীয় আকরিক থেকে তামাকে মুক্ত করিয়েছিল। ওরাই নাকি প্রথম কাঠকয়লার উনানে পুড়িয়েছিল তামা-পাথরকে। ফলে প্রথম পর্যায়ে উচ্চ-তাপে তামার অক্সাইড ও কারবন-ডাই-অক্সাইড গ্যাসে পরিণত হয়েছিল এবং

দ্বিতীয় পর্যায়ে কয়লার সাহায্যে বিজারিত হয়ে পরিণত হয়েছিল ধাতব তামাতে।

আবিষ্কার করতে সক্ষম হলেও ভালভাবে কাজে লাগাতে পারেনি তারা। কেননা তামা-পাথর থেকে তামাকে মুক্ত করতে যে পরিমাণ তাপমাত্রার দরকার হয় তার চেয়ে অনেক বেশী তাপমাত্রার দরকার হয় তামাকে গলাতে। এই কাজটি সম্পন্ন হয়েছিল খ্রীষ্টপূর্ব ৩৫০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে হাপর আবিষ্কারের পরে।

কামারশালায় তোমরা হয়ত অনেকেই হাপর দেখে থাকবে। উপরে ও নিচে থাকে দুখানা তক্তা এবং তক্তাদুটাকে চামড়া দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়। তলায় একটা বড় ফুটোর ভেতরে একটুকরা চামড়া ভাল্বের মত জুড়ে দেওয়া থাকে। সামনে একটা নল থাকে এবং সেই নলের শেষপ্রান্ত কয়লার উনানের ভেতর ঢোকানো থাকে। অপরপ্রান্তে দড়ি দিয়ে একবার টানতে ও আরবার ছাড়তে হয়। ছেড়ে দিলে ফুটো দিয়ে এবং ভাল্বকে সরিয়ে আপনা হতে বাতাস ঢুকে পড়ে। টান দিলে ভেতরের বায়ুর চাপে ভাল্বটা ছিদ্রের মুখ বন্ধ করে দেয় এবং বাতাস উনানের ভেতরে রাখা নির্গমন নল দিয়ে ঝাপটার আকারে বেরিয়ে আসে। তার ফলে তাপমাত্রা অনেক বেড়ে যায়। আর সেই তাপমাত্রায় তামা গলতে আরম্ভ করে। প্রকৃতপক্ষে তামাকে গলাতে সক্ষম হওয়ার পরেই প্রস্তরযুগ বিদায় গ্রহণ করে এবং তাম্র যুগের সূচনা হয়।

তামার পরে মানুষ ব্রোঞ্জ ও পেতলকে কাজে লাগায়। দুটির কোনটিই মূল ধাতু নয়। দুটি ভিন্ন ভিন্ন ধাতুর মিশ্রণ—নাম ধাতুসঙ্কর। ব্রোঞ্জ হচ্ছে তামা এবং টিন নামক দুটি ধাতুর মিশ্রণ আর পেতল হচ্ছে তামা ও দস্তার মিশ্রণ। তাই বলে প্রথম প্রথম টিন ও দস্তাকে নিষ্কাশন করতে সমর্থ হয়নি।

তাহলে কেমন করে সেকালে ঐ দুটি ধাতুসঙ্কর তারা লাভ করেছিল।

এও এক আকস্মিক আবিষ্কার ধরা যেতে পারে। তামার আকরিক খুঁজতে খুঁজতে তারা এমন একধরণের আকরিক পেয়েছিল যার মধ্যে অল্পস্বল্প টিন অথবা দস্তা মেশানো ছিল। বহু দেশে এখনও এই ধরণের আকরিক পাওয়া যায়। সেকালের মানুষ তামার আকরিকের পবিবর্তে যখন এই মিশ্র আকরিকটিকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করেছিল তখন এর বৈশিষ্ট্য দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারেনি। এই আকরিকটি অনেক কম তাপমাত্রায় বিগলিত হয়েছিল। পুনরায় একে গলিয়ে ছাঁচে ফেলার সময়ও বেশী তাপমাত্রার দরকার হয়নি। তদুপরি বিশুদ্ধ তামাকে অতি কষ্টে গলিয়ে ছাঁচে ঢাললে ঠাণ্ডা হওয়ার পর ছোট ছোট ছিদ্র দেখা দিত এবং আকারেও বিকৃতি আসতো। অথচ এই জাতায় আকরিক

থেকে পাওয়া ধাতুতে ওসব কিছুই হতো না। অধিকন্তু ধাতু হলো বেশ শক্ত ও মজবুত।

সেদিন তামা ও টিন মিশ্রিত আকরিকই বেশী পাওয়া যেতো। তাই ঐ জাতীয় আকরিক মানুষ বেশী ব্যবহার করেছিল। ওটি ব্রোঞ্জ ছাড়া অন্য কিছু নয়। ব্রোঞ্জ দিয়ে হাতিয়ার, অলঙ্কার, জিনিসপত্র প্রভৃতি প্রায় সব কিছুই গড়তে আরম্ভ করে। ফলে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। সে যুগটিকে ব্রোঞ্জযুগ বললে মনে হয় অত্যুক্তি হবে না। ঐ যুগে ভূপৃষ্ঠে মিশ্রিত আকরিক যখন প্রায় শেষ হয়ে উঠলো বা মানুষের ক্রমবর্ধমান চাহিদাকে পূরণ করতে পারল না তখন বাধ্য হয়ে দস্তা ও টিনকে নিষ্কাশনের উপায় আবিষ্কার করেছিল এবং তামার সঙ্গে মিশিয়ে সঙ্কর ধাতু তৈরি করেছিল।

টিন আবিষ্কারে ওদের অবশ্য বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। সে সময় কোথাও কোথাও প্রকৃতিতে মুক্ত টিন পাওয়া যেতো আর পাওয়া যেতো টিনের প্রধান আকরিক টিনস্টোন বা ক্যাসিটেরাইট। যেহেতু এটি টিনের অক্সাইড। তাই কাঠ কয়লার সঙ্গে পুড়িয়ে সহজেই লাভ করেছিল টিনকে। অপরপক্ষে দস্তাকেও হয়ত জিঙ্কাইট (দস্তার অক্সাইড) বা ক্যালামাইন (দস্তার কারবনেট) নামক আকরিকগুলি থেকে পূর্বোক্ত উপায়ে নিষ্কাশন করেছিল।

তামা, টিন ও দস্তার পরে মানুষ রূপা ও সীসাকে আবিষ্কার করেছিল। রূপাকে অতি অল্প পরিমাণে হলেও মুক্ত অবস্থায় প্রকৃতিতে পাওয়া যেতো। সীসার সেরুসাইট (সীসার কারবনেট) ও লেড ওকর (সীসার অক্সাইড) নামক দুটি আকরিক থেকে হয়ত কাঠ কয়লা দিয়ে পুড়িয়ে সীসাকে পেয়েছিল আর সীসার সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় পেয়েছিল রূপাকে।

অতঃপর আবিষ্কৃত হয়েছে মানবসভ্যতার অতি প্রয়োজনীয় ও যুগান্তকারী উপাদান লোহা। খ্রীষ্টজন্মের প্রায় দেড়হাজার বছর আগে কোন কোন উপজাতি লোহাকে কাজে লাগাতে সক্ষম হলেও লোহার ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়েছে খ্রীষ্টজন্মের মাত্র ৮০০ বছর আগে। সেই থেকে যে যুগটি আরম্ভ হয়েছে তাকে লৌহযুগ বলা হয়। লৌহযুগের অবসান এখনও হয়নি। ঘরসংসার ও কৃষিকাজের সাজসরঞ্জাম থেকে যে কোন ধরণের মেসিন, যন্ত্রপাতি সবই লোহার।

প্রথম লোহা নিষ্কাশিত হয়েছিল লৌহ খনিজে সমৃদ্ধ এশিয়া মাইনর অঞ্চলে। অনেকের মতে হিট্টাইট্ নামে এক জাতি কাঠকয়লার সাহায্যে লোহা পাথরকে গলিয়ে লোহাকে নিষ্কাশন করেছিল। সেকালে লোহার দাম ছিল সোনা

অপেক্ষাও বেশী। আর যারাই এই লোহাকে নিষ্কাশন করতে সমর্থ হয়েছিল তারাই উন্নত হাতিয়ার তৈরি করে বিশ্বে এক ত্রাসের সঞ্চার করেছিল। প্রাচীন তাম্রযুগ, সুপ্রাচীন নগরসভ্যতা, সবই অবসান হয়েছিল লোহা আবিষ্কারের পরে। অর্থাৎ লৌহ আবিষ্কর্তাদের দ্বারা ধ্বংস হয়েছিল পূর্বের তাম্রযুগের নরম সভ্যতাগুলি।

লোহার পরে মানুষের হাতে এসেছিল পারদ নামক ধাতুটি। ধাতু হওয়া সত্বেও পারদ তরল পদার্থ এবং এই একটি ধাতুই স্বাভাবিক অবস্থায় তরল। কথিত আছে, খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে কিমিয়াবিদরা (মিশর, ভারতবর্ষ, গ্রীস প্রভৃতি দেশে সেকালে একদল রসায়নবিদের আবির্ভাব হয়েছিল। তাঁদের ধারণা ছিল, গাছগাছড়া ও জড়বস্তু থেকে এমন পদার্থ নিষ্কাশন হতে পারে যা মানুষকে দীর্ঘ-জীবন এমনকি অমরত্বও দান করতে পারবে। আর এমন কিছু আবিষ্কার করা যাবে যার দ্বারা লোহাকে স্পর্শ করালে সোনায় পরিণত হবে। দুটি জিনিসের কোনটিই তাঁরা আবিষ্কার করতে পারেননি বলে মনে হয়। তবে এমন কিছু কিছু রাসায়নিক পদার্থ আবিষ্কার করেছিলেন যার দ্বারা যথেষ্ট সমৃদ্ধ হয়েছে রসায়নবিজ্ঞান। সেকালে সেই গবেষকদেরই বলা হয় কিমিয়াবিদ বা অ্যালকেমিস্ট) পারদকে আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন পারদকে সোনা বানাতে। পারদের উল্লেখযোগ্য একটি আকরিক সিনাবার বা হিঙ্গুলকে এবং আর একটি আকরিক স্বর্ণসিন্দুর বা মারকারি সালফাইডকে প্রাচীন ভারতীয়রা ঔষধ এবং রঙ তৈরির কাজে ব্যবহার করতেন। স্বর্ণসিন্দুর ভারতীয়দেরই আবিষ্কার।

উপরোক্ত মাত্র কয়েকটি ধাতু ছাড়া অন্যান্য ধাতুর পরিচয় একরকম অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্তও মানুষের কাছে অজানা ছিল। আর এও সত্য যে, অ্যালুমিনিয়াম সহ উপরোক্ত ধাতুগুলিই আমাদের কাছে সর্বাধিক পরিচিত এবং আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক চাহিদা ওরাই মেটায়।

বর্তমানে আবিষ্কৃত মৌলিক পদার্থগুলির মধ্যে ধাতুর সংখ্যাই বেশী। এরা অতি উত্তমভাবে তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবহন করতে পারে, আলোকের প্রতিফলন ঘটায়, আঘাতে না ভেঙ্গে প্রসারিত হয় এবং পারদ ছাড়া সবাই সাধারণ উষ্ণতায় কঠিন ও স্ফটিকের মত দেখতে। লিথিয়াম, সোডিয়াম, পটাসিয়াম প্রভৃতি কয়েকটি ধাতু ছাড়া অপরাপরদের ঘনত্ব বেশী। ঘনত্বের দিক থেকে ধাতুদের প্রধান দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। লিথিয়াম, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, রুবিডিয়াম, সিজিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম প্রভৃতি ধাতুগুলির ঘনত্ব ৬.০

অপেক্ষা কম হওয়ায় বলা হয় হালকা ধাতু বা লাইট মেটাল। অপরাপর সমস্ত ধাতুকে বলা হয় ভারী ধাতু বা হেভি মেটাল।

ধর্ম ও ব্যবহারের দিক থেকেও ধাতুকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। (১) যারা সহজে রাসায়নিক ক্রিয়া করে না তাদের বলা হয় বর ধাতু বা নোবল মেটাল। যেমন সোনা, প্লাটিনাম প্রভৃতি। (২) তামা, দস্তা, লোহা, নিকেল প্রভৃতির ধাতুর অধিকতর রাসানিক সক্রিয়তার জন্য বলা হয় অবর ধাতু বা বেস মেটাল। (৩) তামা, সিলভার বা রূপা এবং সোনা দিয়ে মুদ্রা প্রস্তুত হওয়ায় এদের মুদ্রা ধাতু বলা হয়। এখন নিকেল ও অ্যালুমিনিয়াম দিয়েও মুদ্রা তৈরি হচ্ছে। (৪) কতকগুলি সমধর্মী ধাতু জলের সংস্পর্শে তীব্র ক্ষার তৈরি করতে সক্ষম হয়। যেমন লিথিয়াম, সোডিয়াম, পটাসিয়াম প্রভৃতি। এদের বলা হয় ক্ষার ধাতু। (৫) ম্যাগনেসিয়াম ও ক্যালসিয়াম ধাতুর সাধারণ মাটির মত তাপ প্রয়োগে বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটে না। অপরদিকে ওদের ক্ষারীয় গুণও বিদ্যমান। সেই কারণে ওদের নাম দেওয়া হয়েছে মৃৎক্ষার ধাতু। (৬) ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম, রেডিয়াম প্রভৃতি কতকগুলি ধাতু থেকে আলো ও অন্ধকারে যেকোন অবস্থায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে এক ধরণের রশ্মি নির্গত হয়। এই রশ্মি প্রোটন, নিউট্রন ও ইলেকট্রন কণিকা ছাড়া অন্য কিছু নয়। রশ্মি নির্গমন হতে হতে একদিন ওরা সাধারণ সীসাতে পরিণত হয়ে যায়। এই কারণে ওদের বলা হয় তেজস্ক্রিয় ধাতু। পৃথিবীতে এদের পরিমাণ কিন্তু খুবই অল্প। কৃত্রিমভাবেও অনেক তেজস্ক্রিয় ধাতুকে উৎপন্ন করা গেছে।

বসুমতী বড়ই কৃপণা। অতি অল্প পরিমাণ তামা, সোনা, রূপা ও প্লাটিনাম ছাড়া অন্য কোন ধাতুকে প্রকৃতিতে মুক্ত অবস্থায় পাওয়া যায় না। সবাই যৌগের আকারে অবস্থান করছে। সাধারণভাবে প্রকৃতিতে ওদের অক্সাইড, সালফাইড, সালফেট, ফসফেট, নাইট্রেট, সিলিকেট, কারবনেট ইত্যাদির আকারে পাওয়া যায় এবং এই যৌগগুলি থেকে অনেক কষ্টে ধাতুকে মুক্ত করা হয়।

ধাতুর ঐ যৌগগুলি ভূপৃষ্ঠেও তত বেশী পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় ভূগর্ভে শিলা বা পাথররূপে। এক এক জায়গায় এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে এদের কোন কোনটি পর্যাপ্ত পরিমাণে জমা হয়ে আছে। সাধারণভাবে যে ধাতুর যৌগগুলি ভূগর্ভের যেখানে জমা হয়ে আছে সেই জায়গাটিকে সেই ধাতুর খনি বলা হয়। আর প্রকৃতিজাত এই সব অজৈব পদার্থগুলিকে বলা হয় খনিজ।

আরও মজার কথা, যে কোন ধরণের ধাতব যৌগ তথা খনিজ থেকে ধাতু নিষ্কাশন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। একেবারে যে অসম্ভব এমন নয়। কারণ,

বিজ্ঞানের অভিধানে অসম্ভব বলে কোন কথা নেই। শুধু নিষ্কাশন করতে গেলে খরচে পোষাবে না। অন্যভাবে একটু ঘুরিয়ে বলতে গেলে বলতে হয়, সেইসব যৌগ থেকে ধাতু নিষ্কাশনের সহজ উপায় এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। ধরা যাক, আমাদের সাধারণ কাদামাটির কথা। ওতে যথেষ্ট অ্যালুমিনিয়াম নামক ধাতুটি থাকে। কিন্তু কাদামাটি থেকে অ্যালুমিনিয়ামকে সহজে এবং অল্প খরচে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। লোহার একটি খনিজ আয়রন পাইরাইটিসের প্রসঙ্গও আনা যেতে পারে। এই খনিজটি থেকে লোহাকে নিষ্কাশন করলে খরচ এত বেশী পড়বে যে বাজারের লোহার প্রায় দশগুণ দাম করতে হবে। অতএব যে-কোন খনিজ থেকে ধাতু নিষ্কাশন করার যথেষ্ট অসুবিধা আছে। কেবলমাত্র বিশেষ বিশেষ খনিজ থেকে ধাতুকে নিষ্কাশন করা হয় মাত্র। ঐ কারণে যে খনিজ থেকে সহজ পদ্ধতিতে ধাতু নিষ্কাশন করা যায় তার একটা পৃথক নাম দেওয়া হয়েছে। নামটি হল আকরিক।

কোন আকরিক থেকে ধাতুকে নিষ্কাশন করতে গেলে অনেকগুলি পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়। সেই পদ্ধতিগুলিই একত্রে ধাতুবিদ্যা। অবশ্য এই বিদ্যার মধ্যে আকরিকের পরিচিতিও অন্তর্ভুক্ত। প্রাচীনকালে এই বিদ্যা আদৌ সমৃদ্ধ ছিল না। সেদিন অধিকাংশ ক্ষেত্রে কেবল অক্সাইড জাতীয় আকরিককেই কাজে লাগানো হতো। প্রথমে পুড়িয়ে নিতো তারপর পোড়া আকরিককেই কাঠকয়লার চুল্লীতে হাপরের সাহায্যে বাতাসের ঝাপ্টা লাগিয়ে গলিয়ে নিতো। উক্ত ব্যবস্থায় যতটুকু ধাতুকে তারা লাভ করতো তাতেই সন্তুষ্ট থাকতো তারা। কিন্তু আজকের দিনে মানুষের চাহিদা অনেক। কেবলমাত্র অক্সাইড জাতীয় আকরিক বর্তমানের চাহিদা পূরণ করতে পারে না। তাই অক্সাইড ছাড়া সালফাইড জাতীয় আকরিক থেকেও ধাতুকে নিষ্কাশন করা হচ্ছে।

আকরিক থেকে ধাতুকে নিষ্কাশন করতে হলে যে পদ্ধতিগুলি অবলম্বন করতে হয় তার মধ্যে প্রথম পদ্ধতি হচ্ছে আকরিক থেকে ময়লাকে অপসারণ করা। মাটি, বালি এবং নানাপ্রকারের অবাঞ্ছিত ধাতু এত বেশী পরিমাণে অবস্থান করে যে, কোন কোন ক্ষেত্রে মূল ধাতুটি শতকরা মাত্র দশ-পনের ভাগের বেশী থাকে না। আবার এক একটি আকরিকের ক্ষেত্রে শতকরা পঞ্চাশ বা আরও বেশী থাকে। এই ময়লাগুলোকে সাধারণত খনিজ মল বলা হয়।

ময়লা অপসারণের ব্যাপারে কতকগুলি সহজ উপায় অবলম্বন করা হয়। প্রথমে আকরিকগুলোকে গুঁড়ো করে ফেলতে হয়। তারপর ময়লাগুলোর বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে হয় জলস্রোতে চালিত করিয়ে, নয়ত চুম্বকের দ্বারা কিছু কিছু

অপদ্রব্যকে বেছে ফেলা হয়। তাছাড়া আরও একটি পদ্ধতিও আছে। পদ্ধতিটির নাম তেল-জল পদ্ধতি। প্রথমে আকরিককে মিহিভাবে গুঁড়া করে জলে ফেলা হয় এবং একটু পাইন জাতীয় তেল ও সোডিয়াম জ্যান্থেট মিশিয়ে দেওয়া হয়। অতঃপর মিশ্রণটিকে ভালভাবে আলোড়িত করা হয় আর বাতাসের বুদবুদ প্রবেশ করানো হয়। এতে মাটি, বালি ইত্যাদি থিতিয়ে পড়ে এবং প্রয়োজনীয় বস্তুটি ফেনাতে ভাসতে থাকে। পদ্ধতিটি সালফাইড জাতীয় আকরিককে গাঢ় করতে প্রয়োগ করা হয়।

আকরিক থেকে অপদ্রব্যগুলিকে যতদূর সম্ভব পৃথক করে নেওয়ার পর ধাতু নিষ্কাশনের পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়। নিচে বহুলভাবে অনুসৃত পদ্ধতিগুলির যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করা গেল।

(১) তাপ প্রয়োগ—কোন কোন ক্ষেত্রে গাঢ় আকরিককে কেবলমাত্র তাপ প্রয়োগ করতে থাকলে ধাতুতে রূপান্তরিত হয়ে পড়ে; যেমন হিঙ্গুলকে উত্তপ্ত করলেই পারদ পাওয়া যায়।

(২) প্রতিস্থাপন পদ্ধতি—অ্যালুমিনিয়াম চূর্ণের সঙ্গে কোন কোন আকরিককে মিশিয়ে তীব্রভাবে উত্তপ্ত করলে ধাতু মুক্ত হয়। পদ্ধতিটি গোল্ডস্মিথ থার্মাইট নামে পরিচিত এবং এই উপায়ে ম্যাঙ্গানিজ ও ক্রোমিয়ামকে নিষ্কাশন করা হয়।

রূপার আকরিক থেকে রূপাকে মুক্ত করতে হলেও অনুরূপ পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়। এর জন্য ব্যবহার করা হয় সীসা ও দস্তা।

(৩) অক্সাইড আকরিক থেকে ধাতুনিষ্কাশন—যে-কোন অক্সাইড আকরিক থেকে ধাতু নিষ্কাশন করতে হলে তিনটি প্রধান ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়। (ক) সর্বপ্রথম আকরিককে তীব্রভাবে উত্তপ্ত করা হয়। ফলে আকরিকের মধ্যে যেসব পদার্থ সহজে বাষ্পীভূত হয়ে উবে যেতে পারে সেগুলি দূরীভূত হয়ে আকরিককে সচ্ছিদ্র ও ফাঁপা করে তোলে। প্রাথমিক এই পদ্ধতিটিকে বলা হয় ভস্মীকরণ। (খ) ভস্মীকরণের পর আকরিককে পুনরায় অতিরিক্ত বাতাসের সংস্পর্শে পোড়ানো হয়। এতে যদি অপদ্রব্য হিসাবে কিছু সালফাইড জাতীয় পদার্থ থাকে তাহলে সেগুলি বায়ুর অক্সিজেনের সংস্পর্শে অক্সাইডে পরিণত হয়। পদ্ধতিটি তাপজারণ পদ্ধতি নামে খ্যাত এবং অনেক ক্ষেত্রে ভস্মীকরণ ও তাপজারণ একই চুল্লীতে সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। (গ) ভস্মীকরণ ও তাপজারণের পর বিশেষ ধরণের চুল্লীতে ও বিশেষ তাপমাত্রায় কোককয়লার গুড়ার সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটানো হয়। ফলে আকরিকটি বিজারিত হয় এবং

উৎপন্ন হয় ধাতু। লোহা ও দস্তাকে ঠিক এইভাবে নিষ্কাশন করা হয়। পদ্ধতিটিকে বলা হয় বিগলন। আর লোহার আকরিক থেকে লোহাকে নিষ্কাশন করতে যে চুল্লীর ব্যবহার হয় তাকে বলে ব্লাস্ট ফার্নেস। শতাধিক ফিট উঁচু ইস্পাতের পাত দিয়ে তৈরি এই চুল্লীর অভ্যন্তরে অগ্নিসহা ইস্টকের আস্তরণ থাকে। মাঝখানটা মোটা। সেখানটায় গরম বায়ুর ঝাপটা লাগানোর জন্য থাকে নল। কেন্দ্রস্থলে তাপমাত্রা সৃষ্টি করা হয় ১৫০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের মত। আকরিকের ময়লাগুলোকে অপসারণের জন্য চুনাপাথর যোগ করা হয়। একে বলা হয় বিগালক। বিগালকের দ্বারা অপসারিত ময়লা পৃথক হয়ে পড়ে এবং এই অপসারিত ময়লাকে বলে ধাতুমল।

আকরিক যদি কারবনেট হয় তাহলে তাকেও তাপজারণ ও কয়লারদ্বারা বিজারিত করা হয়।

(৪) সালফাইড আকরিক থেকে নিষ্কাশন—সালফাইড আকরিকের ক্ষেত্রেও তিনটি বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়। (ক) আকরিককে ভালভাবে গুঁড়া করে তেলজল পদ্ধতিতে গাঢ় করতে হয়। (খ) গাঢ় আকরিককে বিশেষ চুল্লীতে এবং বিশেষ তাপমাত্রায় পর্যাপ্ত পরিমাণ বায়ু প্রবাহের দ্বারা পরিণত করা হয় অক্সাইডে। (গ) অতঃপর পূর্বের অক্সাইড পদ্ধতিতে বিগলনের মত কোককয়লার সাহায্যে বিজারিত করিয়ে ধাতুতে রূপান্তরিত করা হয়। এক্ষেত্রেও অনেক সময় সাহায্য গ্রহণ করতে হয় সেই ব্লাস্ট ফার্নেসের।

সীমা, দস্তা, তামা, নিকেল প্রভৃতি ধাতুগুলিকে তাদের সালফাইড আকরিকগুলি থেকে অনুরূপ উপায়ে নিষ্কাশন করা হয়ে থাকে।

(৫) তড়িৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতি—কোন কোন ধাতুর আকরিক থেকে উপরোক্ত পদ্ধতিগুলিতে ধাতু নিষ্কাশন সম্ভব না হলে অথবা কিছু কিছু আকরিক থেকে সহজে ধাতু নিষ্কাশন করতে হলে তড়িৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়।

তড়িৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে বিশেষ ধরণের পাত্রে বিগলিত কোন আকরিক অথবা ধাতুর কোন যৌগকে রেখে তড়িৎদ্বারের মাধ্যমে বিদ্যুৎকে পরিচালিত করা হয়। তখন ধাতুটি মুক্ত হয়ে ঋণাত্মক তড়িৎদ্বারে জমা হয়।

ক্যালসিয়াম ও অ্যালুমিনিয়ামের অক্সাইড প্রকৃতিতে যথেষ্ট পাওয়া যায়। কিন্তু কোককয়লার সাহায্যে ওদের বিজারিত করতে গেলে বিজারিত না হয়ে নতুন যৌগ উৎপন্ন করে। তাই এদের ক্ষেত্রে তড়িৎ বিশ্লেষণ ছাড়া উপায় নেই। অপরদিকে বিগলিত অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড তড়িৎ উদাসীন। সেই কারণে তড়িৎ বিশ্লেষণ করতে গেলে ওতে অল্প ক্রায়োলাইট মেশাতে হয়। আর ঐ কারণেই দীর্ঘকাল অ্যালুমিনিয়াম একরকম মানুষের অগোচরে ছিল।

আমাদের পরিচিত ধাতুদের মধ্যে লোহা ও অ্যালুমিনিয়ামের ব্যবহার ব্যাপক। এছাড়া কিছু কিছু সঙ্কর ধাতুও চোখে পড়ে। যেমন পেতল, কাঁসা তামা, টিন, জার্মান সিলভার, তামা, দস্তা, নিকেল, ব্রোঞ্জ, স্টেনলেস স্টিল ইত্যাদি। এদের তৈরী করা হয় নির্দিষ্ট পরিমান দু কিংবা তিন বা তারও অধিক ধাতুকে মিশিয়ে। আজকের উন্নত যন্ত্রপাতির যুগে সঙ্কর ধাতুর আছে উল্লেখ যোগ্য ভূমিকা। যেমন, যে সব টারবাইনে উত্তপ্ত স্টিম ব্যবহার করা হয় তার ব্লেড তৈরি করা হয় মোনাল মেটাল নামক নিকেল, তামা, লোহা ও ম্যাঙ্গানিজের সঙ্কর। শল্যচিকিৎসার আধুনিক সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি তৈরিতে ব্যবহার করা হয় নাইক্রোম, ক্রোম ইস্পাত এবং ক্রোমিয়াম-কোবাল্ট-টাংস্টেন কারবন সঙ্কর স্টেলাইট। স্থায়ী চুম্বকের জন্য দরকার হয় কোবাল্ট ইস্পাত। উড়োজাহাজের কাঠামো তৈরি করতে লাগে অ্যালুমিনিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের সঙ্কর ম্যাগলেনিয়াম এবং অ্যালমিনিয়াম-তামা-ম্যাগনেসিয়ামে-ম্যাঙ্গানিজের সঙ্কর ডুরালুমিন। যেখানে খুব বেশী তাপমাত্রার সম্ভব হয় সেখানে ব্যবহার করা হয় চুম্বক উদাসীন তামা ও বেরিলিয়ামের অতি কঠোর সঙ্কর। যন্ত্রপাতির বল তৈরিতে লাগে টিন, তামা, অ্যান্টিমনি ও দস্তার সঙ্কর হোয়াইট মেটাল। ছাপার টাইপের জন্য দরকার হয় সীসা, টিন ও অ্যান্টিমনির সঙ্কর টাইপমেটাল। জল সরবরাহের পাইপ জোড়া দেওয়া হয় উডমেটাল ও রোজ মেটাল নামক বিসমাথের দুটি সঙ্কর। এইভাবে কত কাজে যে ব্যববহার করা হচ্ছে তার যেন ঠিকঠিকানা নেই।

কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় জ্বালানী

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে রান্নাবান্না ও অন্যান্য প্রয়োজনে, গাড়ী-মোটর কল-কারখানা সচল রাখতে, হরেকরকমের শিল্পের কাজে, ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রেই দরকার হয় তাপ উৎপাদনের। ঐ তাপকে আবার উৎপাদন করতে প্রয়োজন হয় নানারকম দাহ্য বস্তুকে জ্বালিয়ে। আর ঐ দাহ্য বস্তুগুলোকেই আমরা বলি জ্বালানী।

ঘরে বাহিরে সাধারণত তিনধরণের জ্বালানী চোখে পড়ে। কঠিন, তরল ও গ্যাসীয়। কঠিন জ্বালানী বলতে কাঠ অথবা যেকোন উদ্ভিদের দেহাংশ, কয়লা, ঘুঁটে ইত্যাদিকে বোঝায়। কেরোসিন, ডিজেল, পেট্রোল, স্পিরিট প্রভৃতি তরল জ্বালানী এবং প্রকৃতিতে প্রাপ্ত দাহ্য গ্যাস অথবা কঠিন কিংবা তরল জ্বালানী থেকে বিশেষ উপায়ে প্রস্তুত গ্যাসকে গ্যাসীয় জ্বালানী বলা হয়। অবশ্য গ্যাসীয় জ্বালানীর ব্যবহার শুরু হয়েছে সর্বাধুনিক কালে।

মানুষের ইতিহাস তো আজকের নয়! কত সহস্র সহস্র বছর সে গুহায় ও অরণ্যে কাটিয়েছে। যখন মানুষ আগুন জ্বালাতে শেখেনি তখন পৃথিবীর অধিকাংশ স্থলভাগ অরণ্যে অরণ্যে ভরে গিয়েছিল। মানুষের সংখ্যাও সেসময় খুব বেশী ছিল না, অপরদিকে ঘরবাড়ী ও আসবাবপত্র নির্মান, অগ্নি প্রজ্জ্বলন ইত্যাদির কোন কিছুকে আয়ত্ত করতে না পারায় অরণ্যের উপর আদৌ চাপ পড়তোনা। আগুনকে আয়ত্ত করার পরই চাপ এলো অরণ্যের উপর।

প্রকৃতপক্ষে আগুনকে বন্দী করার পরই মানুষের বন্দীজীবন শেষ হয় এবং শুরু হয় সভ্যতার বিকাশ। এবার হিংস্রজন্তুর ভয় নিবারিত হলো, রান্না করতে শিখলো, গাছের গুঁড়িকে পুড়িয়ে নৌকার মত জলে ভাসলো, শেষে পাথর থেকে বন্দীনী ধাতুকেও মুক্ত করালো। এখানে এসেও থামলোনা সে। নগর সভ্যতার পত্তন করতে গিয়ে কাঠ জ্বালিয়ে রাশি রাশি ইঁট পোড়ালো। জীবনে নিরাপত্তাও এলো এতদিনে। জন্ম সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে চললো।

মানুষের এত প্রকাণ্ড সব কাণ্ডের মূলে ছিল একমাত্র অরণ্যের কাঠ। হাজার হাজার বছর ধরে ঐ কাঠই তাদের চাহিদা মিটিয়েছিল—কাঠের বিকল্প সেদিন মানুষের কল্পনার বাহিরে ছিল।

কয়লা—মানুষের ক্রমবর্ধমান জ্বালানীর চাহিদা মেটাতে মেটাতে অরণ্য

যেন নিঃস্ব হয়ে পড়লো। বন কেটে তখন কত নগরেরও পত্তন হয়ে গেছে। হাতের কাছে মজুত কাঠ না পেয়ে অন্য জালানীর দিকে নজর ছিল। সেই অন্য জ্বালানীটি কয়লা কাঠের বিকল্প—নতুন সভ্যতার অগ্রদূত।

কয়লার সন্ধান মানুষ মনে হয় আকস্মিকভাবেই লাভ করেছিল। পাথরের অনুসন্ধান করতে গিয়ে ভূপৃষ্ঠ থেকে অল্প গভীরে অতি নিম্নমানের কয়লা আবিষ্কৃত হয়েছিল সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগে। হয়ত সেদিন সেই নিকৃষ্ট কয়লাকে কেউ কেউ তাপ উৎপাদনের কাজে ব্যবহারও করেছিল। কিন্তু ওর ব্যাপক ব্যবহার যেমন ছিলনা তেমনই পৃথিবীর অধিকাংশ সভ্য দেশের কাছে অজ্ঞাতও ছিল।

একরকম মধ্যযুগেই কোন কোন দেশ জ্বালানীর চাহিদা মেটাতে ভূগর্ভের অল্প গভীর থেকে নিম্নমানের কয়লাকে যে উত্তোলন করেছিল তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। পদ্ধতি ছিল অতি সহজ। পাতকূয়ার মত বড় ও গভীর গর্ত খুঁড়ে এবং সিঁড়ি বেয়ে তলায় নামতো। তারপর চারপাশ থেকে কয়লা কেটে ঝুড়ি বোঝাই করতো। কূয়ার উপরে লোক থাকতো দড়ি টেনে ঝুড়িকে ওপরে তোলার জন্য। পদ্ধতি ছিল অনেকটা দড়ি-বালতি সহযোগে কূয়া থেকে জল তোলার মত।

কয়লার খোঁজ পড়ে প্রকৃতপক্ষে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইওরোপে ইঞ্জিনের যুগ শুরু হওয়ার পরে। জ্বালানীর চাহিদা উত্তরোত্তর এমনভাবে বেড়ে চললো যে, কাঠ সে চাহিদা পূরণ করতে ব্যর্থ হলো। তখনই ভূগর্ভে সঞ্চিত এই মূল্যবান জ্বালানীকে হস্তগত করতে নিয়োজিত হলো বহু প্রতিভা। শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের প্রচণ্ড অধ্যবসায়ের ফলে একদিন ভূপৃষ্ঠ থেকে গভীরে যে সব উন্নত মানের কয়লা আত্মগোপন করেছিল তাদেরও আত্মপ্রকাশ করতে হলো। অপর-দিকে কয়লাখনির অনুসন্ধান এবং কয়লাকে জ্বালানীরূপে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহারেরও কিছু কিছু পদ্ধতি আবিষ্কৃত হলো। অতি মূল্যবান এই জিনিসটি আরও ভাল-ভাবে যাতে ব্যবহার করা যায় তার জন্য গবেষণাও রইলো অব্যাহত।

বর্তমানে অন্যান্য শক্তিকে মানুষ হস্তগত করলেও কয়লার ব্যবহার কমেনি বরং আরও বেড়ে গেছে। এখন প্রতিবছর ভূগর্ভ থেকে প্রায় তিনশ কোটি টনের মত কয়লা উত্তোলিত হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, অদূর ভবিষ্যতে উত্তোলনের পরিমাণ বছরে পাঁচশ কোটি টনকেও ছাড়িয়ে যাবে। নিশ্চয়ই ভাবছো, ভূগর্ভে এত কয়লা এলো কেমন করে ?

সে অনেক-অনেক কাল আগেকার কথা। আমাদের এই পৃথিবীর পরিবেশ

ও আবহাওয়াটা ঠিক একইভাবে চলে আসছে না। অতীতে কত ভয়ঙ্কর সব দুর্যোগ, কত ঝড়-ঝঞ্ঝা এর উপর দিয়ে বয়ে গেছে। আজ থেকে প্রায় ত্রিশ কোটি বছর আগে পৃথিবীর স্থলভাগ জুড়ে ছিল কেবল বন আর বন। পৃথিবীর ভেতরটাও ছিল আজকের তুলনায় অনেক বেশী অশান্ত। আগ্নেয়গিরি, ভূমিকম্প, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি ছিল নিত্যসহচর। ফলে যুগে যুগে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সেই সব ঘন বন চাপা পড়ে গেছে মাটির তলায়। তারপর কেটে গেছে কত কোটি কোটি বছর। পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ চাপ ও তাপের প্রভাবে সেগুলি পাথরের মত শক্ত হয়ে কয়লারূপে অবস্থান করছে। আবার এমনও হয়েছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত সেদিনের সেই বনভূমির গাছপালা জলের দ্বারা বাহিত হয়ে হ্রদে এবং সমুদ্রের তীরভূমিতে পলির সঙ্গে স্তরে স্তরে জমা হয়েছে। কালক্রমে জলবাহিত পলি জমা হতে হতে ডাঙার পরিধি বেড়ে গেছে আর তলার গাছপালা ভয়ঙ্কর চাপ ও তাপের প্রভাবে রূপান্তরিত হয়ে গেছে কয়লায়।

এমনিতে সব রকমের কয়লাকে দেখতে প্রায় একই রকমের হলেও বিভিন্ন খনি থেকে উত্তোলিত কয়লার গুণ সবার সমান নয়। প্রচুর অপদ্রব্য তো মেশানো থাকেই, তার উপর কারবণের পরিমাণও সব কয়লাতে সমান নয়।

কয়লার গুণ নির্ভর করে তার কারবনের পরিমাণের উপর। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লাতে কারবনের পরিমাণ থাকে বেশী এবং নিকৃষ্ট শ্রেণীতে থাকে কম।

কয়লায় কারবনের পরিমাণ স্থির করে কয়লাকে চার শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। পিট, লিগনাইট, বিটুমেন ও অ্যানথ্রাসাইট। পিট কয়লায় কারবন থাকে মাত্র ৩৫%, লিগনাইটে থাকে ৩৫% থেকে ৫০%, বিটুমেনে ৫০% থেকে ৮৫% এবং ৯০% থেকে ৯৫% কারবন থাকে অ্যানথ্রাসাইটে।

পিট কয়লায় কারবনের পরিমাণ কম থাকার কারণ, এগুলোর বয়স বেশী নয়। প্রায় সাত কোটি বছর আগে মাত্র মাটি চাপা পড়েছে অথবা গভীরে না থাকার জন্য চাপ ও তাপমাত্রার অভাবে উৎকৃষ্ট কয়লাতে রূপান্তরিত হতে পারেনি।

যে কোন উদ্ভিদদেহ রূপান্তরের মাধ্যমে প্রথমে পিট কয়লায় পরিণত হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে উদ্ভিদদেহকে পীট কয়লায় রূপান্তরিত করতে তিনটি পদার্থ অংশগ্রহণ করে। প্রাথমিক অবস্থায় উৎপন্ন হয় হিউমিক অ্যাসিড এবং উক্ত অ্যাসিড উদ্ভিদদেহকে রূপান্তরিত করে "ব্রাইট কোল" এ। অতঃপর জল ও নানাপ্রকার জীবাণুর ক্রিয়ায় উৎপন্ন হয় সেলুলোজ, লিগনিন, মোম, রজন প্রভৃতি। এরাই তখন উদ্ভিদদেহকে বিয়োজিত করতে সাহায্য করে এবং কালক্রমে পীট কয়লায় পরিণত হয়। তবে পরিবেশের চাপ, তাপ, বায়ু, জল ইত্যাদির উপর

পীটের ধর্ম নির্ভর করে। তাই যে কোন পীট কয়লা একই ধর্ম বিশিষ্ট হয় না।

উদ্ভিদদেহ পীট কয়লায় রূপান্তরিত হওয়ার পর তার মধ্যে অতি ধীর ও মন্থর পরিবর্তন শুরু হয়। এই পরিবর্তন দ্বিধরণের। কলয়িডিয়েল কেমিক্যাল চেঞ্জ এবং ডাইনামো—কেমিক্যাল চেঞ্জ। এই পরিবর্তনগুলি সাধিত হয় প্রাথমিক অবস্থায় উৎপন্ন হিউমিক অ্যাসিডের দ্বারা। কোটি কোটি বছর ধরে পরিবর্তনগুলি চলতে থাকায় জলীয় পদার্থের পরিমাণ কমতে থাকে এবং বাড়তে থাকে কারবণের পরিমাণ। পরিশেষে উন্নত শ্রেণীর কয়লা তথা বিটুমেন, অ্যানথ্রাসাইট প্রভৃতিতে রূপান্তরিত হয়।

উদ্ভিদ দেহ থেকে কয়লায় রূপান্তরের যে উপরোক্ত মতবাদ—তা কল্পনানির্ভর নয়। বিজ্ঞানী বার্জিয়াস পরীক্ষাগারে প্রমাণ করেছেন। তিনি জলীয় পদার্থের উপস্থিতিতে সেলুলোজকে ১৪০° বায়ুমণ্ডলের চাপ ও ৩৪৬° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করায় লাভ করেন কালো রঙের কঠিন পদার্থ লিগনিন। আবার এই ভাবে লিগনিন কে চাপ ও তাপমাত্রা বাড়িয়ে রূপান্তরিত করেছিলেন ব্রাইট কোলরূপে। অপরদিকে পরীক্ষার দ্বারা প্রমানিত হয়েছে, মাটির তলায় মাত্র হাজার ফুট গভীরে তাপমাত্রা ১৮০° সেন্টিগ্রেডের মত এবং চাপ ১২০০ পাউণ্ড বর্গ ইঞ্চিতে। আর এও দেখা গেছে, উঁচু জাতের কয়লা মাটির তলায় বেশ গভীরেই অবস্থান করছে।

এবার উপরোক্ত চারপ্রকার কয়লার গুণাগুণের কথায় আসা যেতে পারে। পীট ও লিগনাইট কয়লায় কারবণের পরিমাণ কম থাকায় জ্বালানীর পক্ষে তেমন উপযুক্ত নয়। জ্বালানীর জন্য প্রয়োজন হয় বিটুমেন কয়লাটাই। অ্যানথ্রো-সাইটে অবশ্য কারবণের পরিমাণ খুব বেশী। তা হলেও ওতে উদ্বায়ী পদার্থ কম থাকায় তাপ উৎপাদন ক্ষমতা কম। তাছাড়া অ্যানথ্রোসাইট খুব বেশী পাওয়া যায় না এবং পাথরের মত শক্ত বলে খনি থেকে উত্তোলন করাও বেশ কষ্ট সাধ্য ব্যাপার। বিজ্ঞানীদের ধারণা, কয়লা ভূগর্ভে রূপান্তরিত হতে হতে একদিন গ্রাফাইটে পরিণত হয়।

এখন দেখা যাচ্ছে, বিটুমেন কয়লাই উত্তম জ্বালানী। এতে কারবণের পরিমাণ একটু কম থাকলে কি হয়, উদ্বায়ী পদার্থ বেশী থাকায় তাপ উৎপাদন ক্ষমতা বেশী। কিন্তু খনি থেকে উত্তোলিত করার পর ওকে সরাসরি জ্বালানী রূপে ব্যবহার করা যায় না। প্রচণ্ড ধোঁয়া হয়। তাই খনি থেকে উত্তোলনের পর গাদা করে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। অবশেষে কিছু ধোঁয়া বেরিয়ে যাওয়ার পর জল ঢেলে আগুনকে নিভিয়ে দেওয়া হয়।

অনুরূপ আগুন ধরিয়ে কয়লাকে শোধন করলে বহু মূল্যবান জিনিসের অপচয় ঘটে। বায়ুনিরুদ্ধ বড় বড় পাত্রে বায়ুর অনুপস্থিতিতে তীব্রভাবে উত্তপ্ত করলে কয়লা উদ্বায়ী ও অনুদ্বায়ী—দুটি অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ে। অনুদ্বায়ী অংশ কোককয়লা হিসেবে পাত্রের তলদেশে পড়ে থাকে এবং উদ্বায়ী অংশ গ্যাসরূপে অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়। উক্ত প্রক্রিয়াকে বলা হয় কয়লার অন্তর্ধূম পাতন। আর আশ্চর্যের কথা, কয়লার অন্তর্ধূম পাতন থেকে তথা গ্যাসকে নষ্ট না করে ধরে রাখলে প্রায় দু'লক্ষের মত মূল্যবান রাসায়নিক পদার্থ পাওয়া যায়।

সাধারণত কয়লার অন্তর্ধূমপাতনের জন্য অগ্নিসহা মৃত্তিকা দিয়ে তৈরি বড় বড় বকযন্ত্র বা চতুষ্কোণ প্রকোষ্ঠ ব্যবহার করা হয়। এবং ঐ উপায়ে কোক কয়লা সংগ্রহ করাকে বলা হয় কয়লার কারবনীকরণ।

উদ্বায়ী পদার্থগুলো—যারা গ্যাসের আকারে বেরিয়ে যায় তাতে তরল ও গ্যাস দুইই থাকে। গ্যাসকে ঠাণ্ডা করলে তরল পদার্থ জমে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ঐ বিচ্ছিন্ন তরলের একভাগে থাকে অ্যামোনিয়াক্যাল দ্রবণ এবং অপর ভাগে থাকে আলবাতেরা। অ্যামেনিয়াক্যাল দ্রবণ থেকে তৈরি করা হয় অ্যামোনিয়াম সালফেট নামক মূল্যবান সার এবং আলকাতরা থেকে পাওয়া যায় সভ্যতার অতীব গুরুত্বপূর্ণ সব উপাদান। উপাদানগুলির মধ্যে প্রধান প্রধান হলো ফিনল, ফুয়েল ওয়েল, বেনজিন, টলুইন, নানাপ্রকার সুগন্ধি ও ওষুধ এবং ন্যাপথ্যালিন।

কয়লার কারবনীকরণে তথা অন্তর্ধূমপাতনে সাধারণও বিটুমেন কয়লাকেই গ্রহণ করা হয়। প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করা হয় দু'ভাবে। (১) নিম্ন উষ্ণতায় এবং (২) উচ্চ উষ্ণতায়।

উচ্চ উষ্ণতায় তথা ১২০০° সেন্টিগ্রেড থেকে ১৪০০° সেন্টিগ্রেড উচ্চতায় কয়লাকে পাতিত করলে কোলগ্যাস ও আলকতরার মধ্যে জৈব পদার্থগুলোর পরিমাণ বাড়ে কিন্তু কোক কয়লার পরিমাণ অনেকখানি কম হয়।

অপর পক্ষে নিম্ন উষ্ণতায় অর্থাৎ ৬০০° সেন্টিগ্রেড থেকে ৭০০° সেন্টিগ্রেডের মধ্যে কয়লাকে পাতিত করলে কোক কয়লা বেশী পাওয়া যায় কিন্তু অন্যান্যদের পরিমাণ যথেষ্ট কম হয়। দুভাবে পতিত করলে দুধরণের কোক কয়লা পাওয়া যায়। নিম্ন উষ্ণতায় কোককে বলা হয় নরম কোক বা সফ্‌ট কোক এবং উচ্চ উষ্ণতায় প্রাপ্ত কোককে বলা হয় শক্ত কোক বা হার্ড কোক।

নিম্ন উষ্ণতায় প্রাপ্ত নরম কোক সহজ দাহ্য বলে রান্নার কাজে এবং ইঞ্জিনে ব্যবহৃত হয়। আর অনুরূপ পাতন থেকে যে আলকাতরা পাওয়া যায় তা থেকে সহজে তরল জ্বালানীও তৈরি করা যায়। অপরদিকে ধাতু নিষ্কাশনে বিজারণের

জন্য যে কোক কয়লার দরকার হয় তা নরম কোকের দ্বারা হয় না। এক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় শক্ত কোকের।

কয়লার এত বহুল ব্যবহার যে, কয়লা ছাড়া আমাদের যেন এক মুহূর্তও চলতে পারে না। ওকে ছাড়া মানব সভ্যতা একরকম অচলই হয়ে পড়বে। অথচ রূপে কী বিশ্রী! হাতে ও কাপড়ে কালো দাগের ভয়ে আমরা ওদের কাছ থেকে সবসময় দূরত্ব বজায় রেখে চলি। আর আলকাতরার তো কথাই নেই। নামটা শুনলেও লাফিয়ে যেন বিশ গজ দূরে সরে যাই। অথচ মজার কথা, এই কয়লার এত গুণ যে ওর নামকরণ করা হয়েছে "কালো মানিক"। কোথায় দরকার নেই কয়লার? কয়লা ছাড়া ঘরের উনান থেকে কলকারখানা, ইঞ্জিন, তাপবিদ্যুৎ-কেন্দ্র সবই অচল।

তোমরা বলবে, নাই বা হল কয়লা? গ্যাস, তেল ও বিদ্যুৎতো আছে। আসলে কি জানো? কয়লা থেকেও কৃত্রিমভাবে পেট্রোলিয়াম তৈরি হয়। তৈরি হয় জ্বালানীর জন্য গ্যাস ও বিদ্যুৎ। অনেক বিজলীবাতিতে কারবন ফিলামেণ্টও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। শুধু কি তাই? প্লাস্টিক, রঙ, ওষুধ, নানারকমের সুগন্ধি, সার, স্যাকারিণ, গ্যাসকারবন, ভূষা, ছাপার কালি প্রভৃতি সভ্যতার নানান উপাদান সংগ্রহ হচ্ছে ঐ কয়লা থেকে। কয়লাকে ধুলে ময়লা যায় না সত্য কিন্তু গুণপণা ব্যাখ্যা করতে আরম্ভ করলে শেষ করা যায় না।

কয়লার ব্যবহার এত বেড়ে চলেছে যে, এইভাবে উত্তোলিত হতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে প্রায় নিঃশেষ হয়ে পড়বে। পণ্ডিতদের মতে ভূগর্ভে সঞ্চিত সব-রকমের কয়লার মোট পরিমাণ ৫০০৮৬০ কোটি টনের মত। তাতে প্রতি বছর উত্তোলিত হচ্ছে ৩০০ কোটি টনের মত। ভবিষ্যতে আরও কলকারখানা বাড়বে এবং কয়লা উত্তোলনের পরিমাণও বাড়বে। হয়ত একবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে উত্তোলনের পরিমাণ ৫০০ কোটি টনও ছাড়িয়ে যাবে। তাহলে চলবে কেমন করে? আর এখনই যদি নিঃশেষ হয়ে যায় তাহলে মানুষের উত্তরাধিকারীরা কি করবে? কেবল হাপিত্যেশ হয়ে ঘুরে বেড়াবে আর কপাল চাপড়ে আমাদের অভিশাপ দেবে এবং অদূর দর্শিতার জন্য ঘৃণ্যর মনোভাব পোষণ করবে?

বিজ্ঞানীরা তাই এখনই কয়লার বিকল্প খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন এবং বিটুমেন কয়লার পরিমাণ কম থাকায় নিকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা লিগনাইটকেও কাজে লাগাবার ব্যবস্থা করেছেন। লিগনাইটকে খুব ভাল করে ধৌত করার পর উচ্চ তাপমাত্রায় অন্তর্ধূম পাতনের দ্বারা সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছেন উচ্চমানের ধাতু-নিষ্কাশনের উপযোগী কোক কয়লা।

লিগনাইট থেকে জ্বালানীর জন্যও কয়লা বর্তমানে প্রস্তুত করা হচ্ছে। সে কয়লা আবার সাধারণ কোক কয়লা থেকে আরও উত্তম। অর্থাৎ নতুন ধরণের উৎপাদিত এই কয়লা পোড়ালে ধোঁয়া হয় না। রান্না ঘরের একেবারে আদর্শ জ্বালানী।

খনি থেকে কয়লা উত্তোলন দস্তুরমত এক বিরাট কর্মযজ্ঞ। হাজার হাজার শ্রমিক ও প্রযুক্তিবিদের সমাবেশ ঘটাতে হয়। যেহেতু মাটির তলায় অনেক গভীরে থাকে কয়লা। খনি বিশেষজ্ঞরা পাথর পরীক্ষা করে বুঝতে পারেন সেখানে কয়লা আছে কিনা। যদি পর্যাপ্ত কয়লা থাকে তাহলেই কর্মযজ্ঞের সূচনা করা হয়। কয়লা কম থাকলে উত্তোলনের খরচ পোষাবেনা।

খনিতে স্তরে স্তরে কয়লা থাকে। দুই স্তরের মাঝে থাকে পাথরের স্তর। ধস যাতে না নামে তার জন্য কয়লা কাটতে গিয়ে মাঝে মাঝে থামের মত রাখতে হয়। এখন আবার কয়লা কেটে নেওয়ার পর শূন্য স্থানকে বালি দিয়ে ভরাটও করা হয়।

খনির মধ্যে ওঠানামা করার জন্য বিশেষ ধরণের বিদ্যুৎচালিত খাঁচা থাকে। অনেকটা লিফটের মত। খনি থেকে উপরে কয়লাকে তুলতেও এখন বিদ্যুতের সাহায্য গ্রহণ করা হয়ে থাকে। খনির ভেতরেও থাকে বিদ্যুতের ব্যবস্থা। আগে অন্ধকার খনি গর্ভে আলো এম সমস্যা ছিল। যেহেতু খনির মধ্যে দাহ্য গ্যাস থাকে। তাই সাধারণ আলোর শিখা বহন করা অর্থে ছিল অগ্নিকাণ্ডের ব্যবস্থা। ডেভি কর্তৃক আবিষ্কৃত নিরাপত্তা বাতিই ছিল খনি শ্রমিকের একমাত্র সহায়। বর্তমানে বিদ্যুৎ সে স্থান পূরণ করছে।

খনির মধ্যে বহু রকমের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হয়। তা সত্ত্বেও দুর্ঘটনা ঘটে। কয়লা কাটতে কাটতে মাঝে মাঝে বিষাক্ত গ্যাস বেরিয়ে আসে, কখনও ধস নামে, কখনও কয়লার আড়ালে বন্দী জল প্রবলবেগে বেরিয়ে এসে প্লাবন ঘটায়। যদিও এসব রোধ করার জন্য আধুনিক উন্নত বিজ্ঞান অনেক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এবং খনি শ্রমিকদের নিরাপত্তা এনেছে অনেকখানি তবুও দুর্ঘটনাও ঘটে মাঝে মাঝে।

কঠিন জ্বালানীর মধ্যে কাঠই আমাদের সর্বাধিক পরিচিত। কাঠের তাপনমূল্য বেশী না হলেও কাঠ সহজে লাভ করা যায়, অতি সহজ দাহ্য এবং ছাইও কম উৎপন্ন হয়। তাইতো সেই আদিকাল থেকে আজও কাঠের ব্যবহার অব্যাহত আছে।

কয়লার মত কাঠকেও খোলাবায়ুতে বা উনানে পোড়ালে বহু মূল্যবান পদার্থের

অপচয় ঘটে। অথচ বায়ুহীন পরিবেশে তাকেও যদি অন্তর্ধূমপাতন করা হয় তাহলে কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় তিন ধরণের জ্বালানীতো পাওয়া যায়ই অধিকন্তু পাওয়া যায় নানাধরণের উপজাত পদার্থ। সেগুলি বর্তমান সভ্যতার এক একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান বলা যেতে পারে।

কাঠের অন্তর্ধূমপাতন ব্যবস্থা কয়লার মতই। কাঠকে কেটে টুকরা টুকরা করে লোহার বকযন্ত্রে রাখা হয়। তারপর বকযন্ত্রকে অনুভূমিক অবস্থায় রেখে তাপমাত্রা প্রয়োগ করতে থাকলে কাঠ বিয়োজিত হয়ে গ্যাস নির্গত হয়। তাপমাত্রা অবশ্য খুব বেশী দরকার হয় না। মাত্র ১৫০° সেন্টিগ্রেড থেকে ৩০০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় বিয়োজন সম্পূর্ণ হয়। উৎপন্ন গ্যাসকে ঠাণ্ডা করলে কতকগুলো পদার্থতরলে পরিণত হয়। আর বাদবাকি গ্যাস হিসাবে বিদ্যমান থাকে। ঐ গ্যাসকে বলে উডগ্যাস। ওতে থাকে কারবন মনঅক্সাইড, মিথেন ও হাইড্রোজেন। সাধারণত জ্বালানী হিসাবে ওকে ব্যবহার করা হয়। নয়ত মাছের তেলে মাছ ভাজার মত অন্তর্ধূমপাতনের সময় বকযন্ত্রকে উত্তপ্ত করতে ব্যয়িত হয়।

যে অংশ তরলে পরিণত হয় তাতে দুটি স্তর থাকে। উপরে থাকে জলীয় স্তর এবং তলায় থাকে আলকাতরার স্তর। কাঠ থেকে অনুরূপ উপায়ে প্রাপ্ত আলকাতরাকে বলা হয় উডটার।

উডটারকেও পাতিত করা হয়। পাতিত করতে থাকলে ২০০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার মধ্যে বিছিন্ন হয় লাইটওয়েল। এই লাইটওয়েল বা হালকা তেল চামড়া শিল্পে ব্যবহার করা হয়। আর পাইন জাতীয় কাঠ যদি হয় তাহলে তা-থেকে পাওয়া যায় তার্পিন তেল নামে একটি মূল্যবান জিনিস।

২০০° সেন্টিগ্রেড থেকে ৩০০° সেন্টিগ্রেডে পাতিত হয় হেভিওয়েল বা ভারী তেল। একে ব্যবহার করা হয় জীবাণুনাশক হিসাবে। অবশিষ্ট হিসাবে পাওয়া যায় উড পিচ। একে ব্যবহার করা হয় রবার শিল্পে ও জুতা প্রস্তুতিতে।

পাতিত তরলের উপরিস্থিত জলীয়স্তরটা অধিক মূল্যবান। এতে থাকে পাইরোলিগ্‌নিয়াস অ্যাসিড নামে একটি দামী পদার্থ। উক্ত অ্যাসিডে থাকে শতকরা ১০ ভাগ অ্যাসেটিক অ্যাসিড, ২.৫ থেকে ৩.৫ ভাগ মিথাইল অ্যালকোহল এবং ০.১ থেকে ০.৫ ভাগ অ্যাসিটোন। বিশেষ পদ্ধতিগুলির দ্বারা ওদের পৃথক করে নেওয়া হয়। তখন অ্যাসেটিক অ্যাসিডকে ব্যবহার করা হয় ভিনিগার, অ্যাসিটেট রেয়ন, ইনডিগো প্রভৃতি উৎপাদনে এবং রঞ্জনশিল্পে।

মিথাইল অ্যালকোহলের ব্যবহারের কোন তুলনাই যেন হয় না। বেকেলাইট

জাতীয় প্লাস্টিক, টেরিলিন, ডাইমিথাইল অ্যামিন, ফরমালডি হাইড, নানা রকমের এস্টার ইত্যাদি প্রস্তুত তো হয়ই অধিকন্তু রাসায়নিক শিল্পেও ওর চাহিদা প্রচুর। আর অ্যাসিটোনকে ব্যবহার করা হয় প্রধানত ক্লোরোফর্ম ও আইডোফর্ম প্রস্তুতিতে।

বকযন্ত্রে অনদ্বায়ী পদার্থ হিসাবে যে অবশেষ পাওয়া যায় তাকে বলা হয় কাঠ-কয়লা। এই কয়লা বেশ উন্নতমানের। বেশ সছিদ্র এবং দহনকালে শিখা হয় না। আর ওকে হাতে করলেও হাতে ময়লা লাগে না। এটি বর্তমানে প্রডিউসার গ্যাসের একটি জ্বালানী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কাঠকয়লা থেকে প্রডিউসার গ্যাস তৈরি করে বাস, লরী ইত্যাদিকে চালনা করা হয়েছিল। কোক কয়লার আবিষ্কারের পূর্বে সহস্র সহস্র বছর মানুষ কাঠকয়লার উপরেই নির্ভর করে এসেছিল।

তরল জ্বালানী—তরল জ্বালানীকে আজকাল প্রায় সর্বক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হচ্ছে। রান্নার স্টোভে, বিমান-মোটর-রেলগাড়ীর ইঞ্জিনে, শস্যভাঙ্গায় ও পাম্পিং মেসিনে, কোথায় নয়? সব জায়গায় যদিও একই ধরণের তরল জ্বালানী ব্যবহার করা হয় না তবে উৎস তাদের একই। অর্থাৎ স্টোভের জন্য কেরোসিন, বিমানের জন্য পেট্রোল, অন্যান্য ইঞ্জিনের জন্য পেট্রোল কিংবা ডিজেল সবই পাওয়া যাচ্ছে খনি থেকে। তাই এদের বলা হয় খনিজ তেল। একে পেট্রোলিয়ামও বলা হয়। খনি থেকে উত্তোলন করার পর ওকে পাতিত করা হয় এবং এই পাতন প্রক্রিয়াকে বলা হয় আংশিক পাতন। যেহেতু পেট্রোল, কেরোসিন, ডিজেল ইত্যাদি বিভিন্ন তাপমাত্রার বাষ্পীভূত হয় এবং যে তরল যে তাপমাত্রায় বাষ্পে পরিণত হয় সেই তাপমাত্রাকে সে তরলের স্ফুটনাংক ধরা হয়। ওদের প্রত্যেকের স্ফুটনাংক পৃথক পৃথক হওয়ার জন্য বিভিন্ন তাপমাত্রায় পাতিত করলে একে একে তরলগুলি আলাদা হয়ে পড়ে। সহজ কথায় এই পদ্ধতিকে বলে আংশিক পাতন।

এখানেও তোমাদের মনে অবশ্যই প্রশ্ন আসবে, খনিতে কেমন করে এত তেল সঞ্চিত হয়েছে? ভূগর্ভে কোথা থেকে এলো এত তেল যাতে সারা পৃথিবীতে এত ব্যবহার সত্বেও তেল নিঃশেষ হচ্ছে না?

ভূগর্ভে তেলের খনি সম্পর্কে অনেকে অনেক মত পোষণ করে থাকেন। তবে অধিকাংশ গবেষকের মতে খনিজ তেল অতীতে মাটির তলায় চাপা পড়া জীবদেহের শেষ পরিণতি।

এবার আরও কতকগুলো প্রশ্ন হয়ত তোমাদের মনে জাগবে, অতীতে বলতে কবে ? কত জায়গায় এবং কি পরিমাণ জীব মাটির নিচে চাপা পড়েছে ?

সে-অনেক কাল আগের কথা আজ থেকে প্রায় ৫০ কোটি বছর পূর্বেও পৃথিবীতে ডাঙা বলতে কিছুই ছিল না বলা যেতে পারে। সারা পৃথিবী জুড়ে ছিল কেবল জল আর জল। সেই জলে এসেছিল অসংখ্য জলচর প্রাণী। ওরা এক এক জায়গায় এক একটা সুবৃহৎ উপনিবেশ গড়ে বসবাস করতো। সংখ্যায় তারা এত থাকতো যে একালে আমরা কল্পনায়ও আনতে পারবো না। জলন্ত উদাহরণ বর্তমানের প্রবাল দ্বীপগুলি। প্রবালরা অতিক্ষুদ্র। অথচ এক এক জায়গায় মৃত প্রবাল এত জমেছিল যে তাদের দেহাবশেষ থেকে উৎপন্ন হয়েছে এক একটি দ্বীপ। তেমনই আদিকালের অসংখ্য জীবদেহও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে মাটি চাপা পড়তে বাধ্য হয়েছিল। মাটির তলায় প্রচণ্ড চাপ ও তাপমাত্রায় এবং অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে এক ধরণের জীবাণুর ক্রিয়ায় জীবদেহগুলি এক-রকম তরলে তথা পেট্রোলিয়ামে পরিণত হয়েছে। এটি অবশ্য অনুমান। পেট্রো-লিয়াম খনিতে লবণজলের উপস্থিতি উপরোক্ত অনুমানের কারণ।

পেট্রোলিয়াম সব জায়গায় জমতে পারেনি। তলায় যেখানে কঠিন শিলাস্তর, অর্থাৎ যে শিলাস্তরের ভেতর দিয়ে তরল চুঁইয়ে যেতে পারে না কেবল তেমন শিলাস্তরের উপরেই পেট্রোলিয়াম জমা হয়ে আছে। এবং উপরেও থাকতে হয় অনুরূপ কঠিন শিলাস্তরকে। এই স্তর আবার সর্বত্র অনুভূমিক অবস্থায় নেই। পৃথিবীর অভিকর্ষবলের জন্য শিলাস্তরগুলি ঢেউয়ের মত উঁচু নিচু হয়ে গেছে। যেহেতু পেট্রোলিয়ামের সঙ্গে কিছু গ্যাসও থাকে। তাই শিলাস্তর ঢেউয়ের মত হয়ে যাওয়ায় চূড়ার মত অংশে থাকে গ্যাস নিচু-বাঁকের মধ্যে অবস্থান করে পেট্রোলিয়াম। তেল আবার জলের চেয়ে হালকা। তাই পেট্রোলিয়াম থাকে উপরে। তার নিচে থাকে তৈলযুক্ত বালুস্তর এবং সর্বনিম্নে থাকে লোনা জলের স্তর।

পেট্রোলিয়াম হাইড্রোজেন ও কারবন নামক দুটি পদার্থের দ্বারা গঠিত কতক-গুলি যৌগ তথা কতকগুলি হাইড্রোকারবনের সমষ্টি। সব খনির পেট্রোলিয়ামে হাইড্রোকারবনগুলি সমান থাকে না। পেট্রোলিয়ামে অবস্থিত হাইড্রোকারবনের চরিত্র অনুযায়ী পেট্রোলিয়ামকে তিন কিংবা চার শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। (১) যে পেট্রোলিয়ামকে প্যারাফিন জাতীয় হাইড্রোকারবণ অধিক তাকে বলা হয় প্যারাফিনভিত্তিক পেট্রোলিয়াম, (২) ন্যাপথিন বেশী থাকলে বলা হয় ন্যাপথিন ভিত্তিক পেট্রোলিয়াম, (৩) প্যারাফিন ও ন্যাপথিন উভয়ই বিদ্যমান থাকলে

বলা হয় মধ্যমভিত্তিক পেট্রোলিয়াম এবং (৪) সুগন্ধি পদার্থ বেশী থাকলে বলা হয় অ্যারোমেটিক ভিত্তিক পেট্রোলিয়াম। তবে শেষোক্ত পেট্রোলিয়াম উন্নত শ্রেণীর। পৃথিবীর সব জায়গায় ওকে পাওয়া যায় না। সুমাত্রা, বোর্ণিও প্রভৃতি অঞ্চলে এই ধরণের পেট্রোলিয়াম পাওয়া যায়।

খনি থেকে যে পেট্রোলিয়াম উত্তোলিত হয় তা প্রাথমিক অবস্থায় কালো ও গাঢ় তরল। বিভিন্ন তরল মিশ্রিত থাকায় এবং প্রত্যেকের স্ফুটনাঙ্ক পৃথক পৃথক হওয়ায় আংশিক পাতনের দ্বারা তাদের বিচ্ছিন্ন করা হয়। সাধারণত ২৫০° সেন্টিগ্রেডের মধ্যে বিচ্ছিন্ন হয় পেট্রোল বা গ্যাসোলিন ও কেরোসিন। ২৫০° থেকে ৩০০° সেন্টিগ্রেডের মধ্যে পাতিত হয় ডিজেল এবং ৩০০° সেন্টি-গ্রেডের উঠে পাওয়া যায় পিচ্ছিল কারক তেল ও প্যারাফিন। অবশেষ হিসাবেও পড়ে থাকে অনেক। যেগুলি থেকে পিচ্ছিলকারক ও জ্বালানী তেল, পেট্রোলিয়াম কোক, পিচ ইত্যাদি তৈরি করা হয়ে থাকে।

তেলের খনি নির্ণয় এবং খনি থেকে তেল উত্তোলন—বিরাট এক কর্মকাণ্ড বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না। প্রাথমিক পর্যায়ে অনুসন্ধানের কাজে প্রয়োজন হয় প্রচুর যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের। প্রথমে বিশেষজ্ঞরা মাটি বা পাথর নিয়ে নানারকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। যদি সন্তুষ্ট হন তাহলে বিরাট এক অঞ্চল জুড়ে অনুসন্ধানের কাজ চালাতে হয়। অনুসন্ধান চালানোর সময় লোহার ডেরিক, পাইপ, পাইপ পোঁতার জন্য ড্রিলিং মেসিন, প্রচুর তার, সিসমোগ্রাফ যন্ত্র এবং বিস্ফোরণ ঘটানোর ব্যবস্থা সঙ্গে করতে হয়। এসব পরিবহনের জন্য দরকার হয় বেশ কয়েক খানা গাড়ী। আর সঙ্গে থাকে যথেষ্ট লোকজন।

খনিজ তেল যেহেতু মাটির অনেক গভীরে থাকে, তাই তার উপস্থিতি সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়ার জন্য ডেরিক খাড়া করিয়ে ড্রিলিং যন্ত্রের সাহায্যে মাটিতে পাইপ পোঁতা হয়।

একটা পাইপের আবার কর্ম নয়। প্রবেশ করাতে হয় বেশ কয়েকটি পাইপকে। প্রথম পাইপের তলায় মাটি কাটার ব্যবস্থা থাকে এবং মাথায় অন্য পাইপ জোড়া লাগানোর জন্য থাকে ক্রু ও প্যাঁচের ব্যবস্থা। নলকূপ বসানোর ক্ষেত্রে যেমন একটির পর একটি পাইপ জোড়া লাগিয়ে মাটির ভেতর ঢোকানো হয়, এও অনেকটা তেমনই। তবে ড্রিলিং যন্ত্র ব্যবহার করার জন্য কাজটা বেশ তাড়াতাড়িই হয়। শক্ত মাটি বা পাথরে যাতে পাইপ আটকে না যায় তারজন্য পাইপের ভেতর দিয়ে জল সরবরাহের ব্যবস্থা থাকে।

একদিকে পাইপ দিয়ে ওঠা জল, কাদা ও পাথরকে পরীক্ষা করা হয়, অপরদিকে

গর্তের ভেতরে বিস্ফোরণ পাঠিয়ে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। বিস্ফোরণের ফলে তলায় যে কম্পন হয়, সেই কম্পন ধরা পড়ে গাড়ীতে রাখা সিসমোগ্রাফ যন্ত্রে। তলায় যদি তেল থাকে তাহলে তরল পদার্থ বলে বিশেষ এক তরঙ্গের সৃষ্টি করবে এবং কম্পনের প্রকৃতি আপনা হতে মুদ্রিত হয়ে যাবে।

অনুসন্ধানের সময় বিশেষ একটি জায়গায় অনুরূপ ভাবে পাইপ পুঁতে পরীক্ষা করা হয় না। বেশ কয়েকটি জায়গায় পরীক্ষা চালাতে হয়। তার কারণ, যদি তেল থাকে তাহলে তার বিস্তৃতি কতদূর জানতে হয়। কম জায়গা জুড়ে তেল থাকলে উত্তোলনের খরচ পোষাবে না।

আজকাল আবার কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থ উৎপাদন করার ফলে তৈল অনুসন্ধানের ব্যাপারটা একটু সহজ হয়েছে। পূর্বোক্ত পদ্ধতি বেশ ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ। তাই অনুসন্ধানের কাজ সহজ করানোর জন্য উপর থেকে পাইপ পুঁতে ছিদ্র করার পর ছিদ্রপথে গাইগার কাউন্টার নামক তেজস্ক্রিয়তা-মাপক যন্ত্র নামিয়ে দিয়ে বিভিন্ন স্তরের তেজস্ক্রিয়তা মাপা হয়। যেহেতু ভূগর্ভে বিভিন্ন স্তরের তেজস্ক্রিয়তা ভিন্ন ভিন্ন। অপরদিকে তৈলবাহী স্তর থাকলে সেখানে তেজস্ক্রিয়তা খুবই অল্প। আশেপাশের কয়েকটা জায়গায় তেজস্ক্রিয়তা মাপার পর তেলের স্তর আছে কিনা অথবা তেলের স্তর কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত তা সহজে নির্ণয় করা যায়।

অপরদিকে কৃত্রিম তেজস্ক্রিয়পদার্থ তথা সন্ধানী পরমাণুর সাহায্যে অনুসন্ধান করতে হলে তৈলবাহী স্তরে ওদের রেখে তেজস্ক্রিয়তা ধরার ব্যবস্থা করতে হয়। এতে সুবিধা এই যে, পাশাপাশি অনেকগুলো জায়গায় খননকার্যের দ্বারা পরীক্ষা চালাতে হয় না। একটি জায়গায় পরীক্ষা চালালেই কতদূর পর্যন্ত তেলের স্তর বিদ্যমান—তা সহজে নির্ণয় করা যায়।

কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থ বা সন্ধানী পরমাণুর কথা একটু বলতে হয়। এদের তৈরি করা হয় পারমাণবিক চুল্লীতে অথবা সাইক্লোট্রন যন্ত্রের সাহায্যে। ধরা যাক, কারবন-১৪ নামক কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় মৌল তৈরি করতে হবে। প্রকৃতিতে সাধারণভাবে কারবন-১২ বা ১২ পারমাণবিক ওজনের কারবন পাওয়া যায়। কিন্তু ১৪ পারমাণবিক ওজনের কারবনই তেজস্ক্রিয় এবং মূল কারবনের একটি সমস্থানিক। সাইক্লোট্রন যন্ত্রে সাধারণ কারবনের উপর দ্রুত অ্যালফা কণার স্রোত প্রবাহিত করিয়ে অথবা পারমাণবিক চুল্লীতে নিউট্রনের দ্বারা কারবনের কেন্দ্রক বিভাজিত করে লাভ করা যায় তেজস্ক্রিয় কারবন।

কৃত্রিমভাবে তৈরি করার জন্য এরা অস্থায়ী। এদের অর্ধায়ু অত্যন্ত কম।

এরা সহজে বিভিন্ন পদার্থের সঙ্গে মিশে যেতে পারে এবং তেজস্ক্রিয়তা বিকিরণের মাধ্যমে নিজের অস্তিত্বকে জানিয়ে দেয়। আর সেই অস্তিত্ব ধরা পড়ে গাইগার কাউন্টার নামক যন্ত্রে। যেহেতু অপরের সঙ্গে সহজে মিশে যাওয়ায় সেখানকার খবর লাভ করা যায় তাই এদের বলা হয় সন্ধানী পরমাণু। কারবন-১৪, কোবাল্ট-৬০, ফসফরাস-৩০ প্রভৃতি এই জাতীয়।

এবার সেই ভূগর্ভস্থ তেলের কথায় আসা যাক। ভূগর্ভে তেলকে উত্তোলিত করেই বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা যায় না। ওতে অনেক অপদ্রব্য থাকে। তাই শোধন করে নেওয়ার পরই ব্যবহার করতে হয়। তাছাড়া কম উদ্বায়ী ও বেশী উদ্বায়ী উভয় ধরণের তেলই মিশ্রিত থাকে। আংশিক পাতন ক্রিয়ায় ওদের বিচ্ছিন্ন করা হয় একে একে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে তৈলখনির কাছাকাছি অঞ্চলে তেলকে শোধন করা সম্ভব হয় না। কোন কোন ক্ষেত্রে পাইপযোগে হাজার হাজার মাইল দূরে বহে নিয়ে গিয়ে শোধন করা হয়। আর একটা শোধনাগার গড়ে তোলাও সহজ নয়। তেল শোধন করে নেওয়ার পর পরিত্যক্ত আবর্জনা যাতে মানুষের কোন ক্ষতি করতে না পারে সে দিকে দৃষ্টি রেখে শোধনাগারের স্থানও নির্বাচন করতে হয়।

সমুদ্রের উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলিতে এবং সমুদ্রের মহীসোপানে বর্তমানে বহু তেলখনির সন্ধান পাওয়া গেছে। অনেক জায়গায় উত্তোলনও করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে জাহাজই সব ব্যবস্থা করে থাকে। অর্থাৎ সেই সব জাহাজ এমনভাবে তৈরি যে, তাতে তৈল অনুসন্ধান থেকে শুরু করে উত্তোলন ও শোধন সব কিছুই করা যায়।

খনিজ তেলের সন্ধান পাওয়া গেছে মাত্র উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। তার আগে ভূপৃষ্ঠের ফাটল বেয়ে কালো কুচকুচে তেলকে যে পাওয়া যেতো না এমন নয়। তবে তার প্রতি কেউ কোনদিন গুরুত্ব আরোপ করেনি। প্রকৃতপক্ষে লর্ড প্লেফেয়ার নামক একজন প্রযুক্তিবিদই প্রথম উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে উল্লেখ করেন, ভূগর্ভে যথেষ্ট তেল আছে এবং ঐ তেলকে শোধন করিয়ে জালানী ও আলো জালাবার কাজে ব্যয় করা যেতে পারে।

প্লেফেয়ারের পর এবিষয়ে চিন্তাভাবনা করেন কর্ণেল ই. এল. ড্রেক। তিনিই প্রথম উন্নত ড্রিল যন্ত্র আবিষ্কার করেন এবং পেনসিলভেনিয়ায় প্রথম তৈলকূপ খনন করেন। ঐ কূপ থেকে দৈনিক ৮০০ গ্যালন হিসেবে পুরো একটি বছর উত্তোলন করা হয়েছিল তেলকে।

এর পর ধীরে ধীরে তৈলের ব্যবহার বাড়তে থাকে। এখন ভূগর্ভস্থ তেলের এত ব্যাপক ব্যবহার যে, ওকে ভূগর্ভের তরল সোনা নামে অভিহিত করা হয়।

খনিজ তেল ছাড়া বর্তমানে কোন কোন ইঞ্জিনে অ্যালকোহলকেও ব্যবহার করা হচ্ছে। তবে শুধু অ্যালকোহলকে ব্যবহার না করে, ওর সঙ্গে অন্যান্য তরলও মেশানো হয়। রকেট ইঞ্জিনে যেসব তরল ব্যবহার করা হয় তাদের মধ্যে অ্যালকোহলও একটি। সাধারণত অ্যালকোহলের সঙ্গে ইথার্, বেঞ্জিন ইত্যাদিকে মিশ্রিত করে পেট্রোল ইঞ্জিনেও ব্যবহার করা হয়।

বর্তমানে পেট্রোলিয়ামের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় সংশ্লেষণ পদ্ধতিতে কয়লা থেকে কৃত্রিমভাবে তরল জ্বালানী প্রস্তুত করা হচ্ছে। দুটি পদ্ধতি প্রচলিত আছে। একটির নাম বার্জিয়াস পদ্ধতি এবং অপরটির নাম ফিসার-ট্রপস পদ্ধতি।

দুটি পদ্ধতিই বিগত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানীরা আবিষ্কার করেছিলেন। যেহেতু সে-দেশে তরল জ্বালানীর অভাব এবং যুদ্ধের সময় তরল জ্বালানীর প্রয়োজন হয় প্রচুর, তাই কৃত্রিম উপায়ে তাঁরা তৈরির ব্যবস্থা করেছিলেন এবং সক্ষমও হয়েছিলেন।

বার্জিয়াস পদ্ধতির মূল কথা, কয়লার সঙ্গে হাইড্রোজেনের বিক্রিয়া ঘটিয়ে হাইড্রোকারবন তৈরি করা। পদ্ধতিটিকে কয়লার হাইড্রোজেনেশনও বলা হয়। প্রথমে ভারী তেলের সঙ্গে কয়লার গুঁড়ো মিশিয়ে একরকম লেই প্রস্তুত করে নেওয়া হয় এবং সেই লেইকে পর্যাপ্ত হাইড্রোজেনের উপস্থিতিতে ৩০০ থেকে ৭০০ বায়ুমণ্ডলের চাপে পিষ্ট করা হয়। তাপমাত্রা সীমাবদ্ধ রাখতে হয় ৪৫০° সেন্টিগ্রেড থেকে থেকে ৫০০° সেন্টিগ্রেডের মধ্যে।

ফিসারট্রপস পদ্ধতিতে কয়লার পরিবর্তে ওয়াটার গ্যাসকে ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে অনুঘটক (যারা রাসায়নিক ক্রিয়ায় নিজেরা অংশগ্রহণ করে না অথচ রাসায়নিক ক্রিয়াকে ত্বরান্বিত অথবা মন্দীভূত করে) হিসাবে ব্যবহার করা হয় লোহার অক্সাইড ও ক্রোমিয়ামের অক্সাইড। ওয়াটার গ্যাসের সঙ্গে জলীয় বাষ্প মিশিয়ে ৪০০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় উপরোক্ত অনুঘটকগুলির সংস্পর্শে চালিত করালে প্রথমে হাইড্রোজেন এবং কারবন-ডাই-অক্সাইড নামে দুটি গ্যাসে পরিণত হয়। অতঃপর বিশেষ পদ্ধতির সাহায্যে সেই গ্যাস মিশ্রণের কারবন-ডাই-অক্সাইডকে কারবন-মনোক্সাইডে পরিণত করতে হয়। পরিশেষে এই মিশ্রণকে উপযুক্ত তাপমাত্রা ও কোবাল্ট অথবা লোহার অনুঘটকের সাহায্যে তরল হাইড্রোকারবনে পরিণত করা হয়ে থাকে।

ফিসারট্রপস পদ্ধতিতে গ্যাসোলিন তো পাওয়া যায়ই, অধিকন্তু পাওয়া যায়

উন্নত মানের ডিজেল। তাই ফিসারট্রপস পদ্ধতিই তরল জ্বালানীকে কৃত্রিম-ভাবে প্রস্তুত করার জন্য বেশী অনুসৃত হচ্ছে। এককালে যুদ্ধের প্রয়োজনের তথা ধ্বংসাত্মক কাজে নিয়োগ করতে গিয়ে পদ্ধতিটির আবিষ্কার হয়েছিল। আজকে অভাবের দিনে সেই পদ্ধতিকে অনুসরণ করতে হচ্ছে সমস্ত উন্নতিকামী দেশ-গুলিকে। অভিশাপ আজ দেখা দিয়েছে আশীর্বাদরূপে। বিজ্ঞানের চরিত্রই এই। এখানে খারাপ বলতে কিছুই নেই। এখন যাকে খারাপ বলে মনে হচ্ছে ভবিষ্যতে সেইটিই মানুষের বিরাট কল্যানের সূচনা করবে।

গ্যাসীয় জ্বালানী—কঠিন ও তরল জ্বালানীর পরিবর্তে এখন আবার গ্যাসীয় জ্বালানীর ব্যবহার শুরু হয়েছে। এবং গ্যাসীয় জ্বালানী থেকে অনেক সুবিধা লাভ করায় ধীরে ধীরে ওর ব্যবহার বেড়ে চলেছে। সবচেয়ে বড় সুবিধা, ওকে জ্বালালে ধোঁয়া হয় না। গ্যাসীয় জ্বালানীর আরও বহু বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ায় এখন রেলইঞ্জিন, বিমান ইঞ্জিন ইত্যাদিকেও চালানো হচ্ছে। এদের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রস্তুত টারবাইনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। গ্যাসের সাহায্যে টারবাইন ঘুরিয়ে ইঞ্জিন চালিকাশক্তি লাভ করে। গ্যাসের সাহায্যে অন্যান্য ইঞ্জিনও চালানো যায় এবং ধাতু নিষ্কাশনেও ব্যবহার করা হয় গ্যাসীয় জ্বালানী।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে জ্বালানী হিসাবে যে-সব গ্যাস ব্যবহার করা হয় তাদের প্রধান কয়েকটি হল—(১) প্রাকৃতিক গ্যাস বা ন্যাচারেল গ্যাস, (২) ওয়েল গ্যাস, (৩) কোল গ্যাস, (৪) প্রডিউসার গ্যাস, (৫) ওয়াটার গ্যাস ও (৬) সেমি ওয়াটার গ্যাস।

প্রাকৃতিক গ্যাস—পেট্রোলিয়ামের খনি থেকেই প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া যায়। পূর্বে খনি থেকে পেট্রোলিয়াম উত্তোলনের সময় ঐ গ্যাসকে নষ্ট করে ফেলা হতো। বর্তমানে ঐ গ্যাসকে আর নষ্ট করা হয় না। একটি মূল্যবান সম্পদ-রূপে পরিগণিত হচ্ছে। অপরদিকে খনিজ তেলের শোধনের সময়ও কিছু কিছু গ্যাস পাওয়া যায়।

প্রাকৃতিক গ্যাসে প্রধানত গ্যাসোলিন, প্রোপেন ও বিউটেন থাকে। গ্যাসোলিনকে নিষ্কাশন করে নেওয়ার পর অবশিষ্ট প্রোপেন ও বিউটেনকে উচ্চ-চাপে তরলে পরিণত করা হয়। ঐ তরলকে তরলীভূত পেট্রোলিয়াম গ্যাস বা লিকুইফায়েড পেট্রোলিয়াম গ্যাস বা সংক্ষেপে এল. পি. জি. (L. P. G.) বলা হয়। এল. পি. জি.-কে ব্যবহার করা হয় প্রধানত রান্নার কাজে।

আমেরিকা ও রাশিয়ার খনিগুলি থেকে প্রচুর পরিমাণে প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া যায়।

ওয়েল গ্যাস বা তেল গ্যাস—লোহিত তপ্ত লোহার উপর কেরোসিন, পেট্রোলিয়াম ইত্যাদিকে ফোঁটা ফোঁটা ফেললে তেল সঙ্গে সঙ্গে বিয়োজিত হয়ে গ্যাসে পরিণত হয়। ঐ গ্যাস প্রধানত হাইড্রোজেন ও কারবনের যৌগ তথা হাইড্রোকারবন।

তেল গ্যাসও উত্তম জ্বালানী। সহজে ওকে উৎপাদন করা যায় বলে ল্যাবোরেটারিতে ব্যবহার করা হয়। পেট্রোলকে বাষ্পীভূত করে ল্যাবোরেটারিতে ব্যবহারের জন্য পেট্রোল বাষ্প তৈরি করা হয়। এক্ষেত্রে তাপের দরকার হয় না।

কোল গ্যাস—খনিজ কয়লার অন্তর্ধূমপাতনে যে গ্যাস উপজাতরূপে পাওয়া যায় তাতে থাকে হরেক রকমের অশুদ্ধি। ঐ কারণে প্রথমত গ্যাসকে ঠাণ্ডা-নলের ভেতর দিয়ে পরিচালিত করে আলকাতরা ইত্যাদিকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়ার পর উপর থেকে ঠাণ্ডা জল ঝরানো হয়। পরিশেষে ফেরিক অক্সাইডের ভেতর দিকে গ্যাসকে অতিক্রম করিয়ে অশুদ্ধিগুলিকে বিতাড়িত করা হয়। অতঃপর গ্যাসকে জমতে দেওয়া হয় গ্যাস ট্যাঙ্কে। সেখান থেকে নল যোগে বিভিন্ন স্থানে প্রয়োজনানুযায়ী সরবরাহ করা হয়।

কোল গ্যাসে সাধারণত ৩০% থেকে ৩৫% মিথেন, ৪৫% থেকে ৫০% ইথিলীন, ৪% কারবন-মনোক্সাইড, ৫% থেকে ১০% নাইট্রোজেন এবং ৫% থেকে ৮% অক্সিজেন ও অন্যান্য গ্যাস থাকে। তাপ উৎপাদনের কাজেই ওকে বেশী ব্যবহার করা হয়।

প্রডিউসার গ্যাস—শ্বেততপ্ত কোককয়লার উপর দিয়ে বায়ুকে পরিচালিত করালে তৈরি হয় প্রডিউসার গ্যাস। তাপমাত্রার দারকার হয় ১০০০° থেকে ১৪০০° সেন্টিগ্রেড। এবং এই গ্যাসের উপাদান ৬২% নাইট্রোজেন, ৩০% কারবন-মনোক্সোইড, ৪% হাইড্রোজেন, ও ৪% কারবন-ডাই-অক্সাইড। প্রডিউসার গ্যাসের তাপউৎপাদন ক্ষমতা কিন্তু বেশী নয়। কিন্তু সহজে ওকে প্রস্তুত করা যায় এবং প্রস্তুতির জন্য নিকৃষ্ট ধরণের কয়লা হলেও অসুবিধা হয় না। তাই গ্যাস ইঞ্জিনে ও ধাতু নিষ্কাশনে ওর ব্যবহার ব্যাপক।

প্রডিউসার গ্যাসের আর একটি অসুবিধা আছে। যখন কয়লার সঙ্গে বায়ুর বিক্রিয়া হয় তখন আপনা হতে কিছু তাপ উৎপন্ন হয়। তাই তাপমাত্রাকে স্থির রাখতে মাঝে মাঝে জলীয় বাষ্পকে পরিচালিত করতে হয়। ফলে তাপমাত্রা কিছুটা নেমে আসে।

ওয়াটার গ্যাস বা জল গ্যাস—১০০০° থেকে ১৪০০° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় লাল তপ্ত কোক-কয়লার উপর দিয়ে জলীয় বাষ্পকে পরিচালিত করলে তৈরি হয় ওয়াটার গ্যাস বা জল গ্যাস। উক্ত গ্যাসের উপাদানগুলির মধ্যে থাকে ৫২% হাইড্রোজেন, ৪০% কারবন-মনোক্সাইড, ২% নাইট্রোজেন, ৪% কারবন-ডাই অক্সাইড, ১% মিথেন ও ১% অন্যান্য গ্যাস থাকে।

ওয়াটার গ্যাসের তাপ উৎপাদন ক্ষমতা প্রডিউসার গ্যাস অপেক্ষা অনেক বেশী। কিন্তু প্রধান অসুবিধা এই যে, কিছুক্ষণ লোহিত তপ্ত কোক কয়লার উপর দিয়ে জলীয় বাষ্পকে চালনা করলে আপনা হতে তাপমাত্রা কমে যায়। অর্থাৎ প্রডিউসার গ্যাসের উল্টোটাই ঘটে তথা বিক্রিয়ায় তাপ শোষিত হয়। আর যখনই তাপমাত্রা কমে যায় তখনই দাহ্য গ্যাসে হাইড্রোজেন ও কারবন-মনোক্সাইডের পরিমাণ যথেষ্ট কম হয়। ঐ কারণে তাপমাত্রাকে ঠিক রাখতে মাঝে মাঝে জলীয় বাষ্পের পরিবর্তে বায়ুকে চালাতে হয়। কিন্তু বায়ুকে চালিত করলে যে গ্যাসকে লাভ করা যায় সেটি প্রকৃত ওয়াটার গ্যাস নয়। যেখানে শুদ্ধ ওয়াটার গ্যাসের দরকার সেখানে বায়ু প্রবাহিত করার সময় গ্যাসকে গ্রহণ করা হয় না। পুনরায় গ্রহণ করা হয় জলীয় বাষ্প চালনা করার কিছুক্ষণ পরে।

লাল তপ্ত কোক-কয়লার উপর দিয়ে পর্যায়ক্রমে জলীয় বাষ্প ও বাতাসকে অতিক্রম করালে যে গ্যাসটিকে পাওয়া যায় তাকে বলে সেমি ওয়াটার গ্যাস। ঐ গ্যাসের উপাদানগুলি যথাক্রমে নাইট্রোজেন ৫৩%, কারবন-মনোক্সাইড ৩০%, হাইড্রোজেন ১২% ও অন্যান্য গ্যাস ৫%।

বায়োগ্যাস—আজকাল জ্বালানীর কাজে বায়োগ্যাসের প্রচলন ধীরে ধীরে বেড়ে চলেছে। বায়োগ্যাস বলতে মানুষ ও অন্যান্য জীবজন্তুর মল এবং আবর্জনা ইত্যাদি থেকে প্রস্তুত গ্যাস। উক্ত গ্যাস তৈরির কাজে কেবলমাত্র গরু কিংবা মহিষের গোবরকেও কাজে লাগালে চলে। তখন এই গ্যাসটির নাম হয় গোবর গ্যাস। গ্যাসটির প্রধান উপাদান মিথেন।

গোবর বা অন্যান্য জীবজন্তুর মলকে একটি ট্যাঙ্কের মধ্যে পচালে জীবাণুর

ক্রিয়ায় উৎপন্ন হয় গ্যাস। সেই গ্যাসকে জমা করা হয় অন্য একটি গ্যাস ট্যাঙ্কে। সেখান থেকে নলযোগে গ্যাসকে সরবরাহ করার ব্যবস্থা থাকে। এই গ্যাস রান্নার কাজে বিশেষ উপযোগী। পচা মল বা আবর্জনা থেকে উৎপন্ন হলেও এর কোন গন্ধ নেই এবং অপরাপর গ্যাসের মত ধোঁয়াও হয় না। অন্যদিকে গ্যাস নির্গমণের পর যে অবশেষ পাওয়া যায় তা একটি উত্তম সার।

গোবর গ্যাস বা বায়োগ্যাসের দ্বারা ইঞ্জিনকেও চালানো যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে দরকার হয় অনেক বেশী গোবরের। সাধারণ রান্নার কাজে এবং একটি আলো জ্বালাতে যে পরিমাণ গ্যাসের দরকার হয় তাতে প্রতিদিন মাত্র ঝুড়ি দুয়েক গোবর এবং কিছু পানা ও আবর্জনা হলেই চলতে পারে। বলাবাহুল্য, ওতে দুদিক থেকে লাভ হয়। প্রথমত গোবরকে ঘুঁটের আকারে জ্বালিয়ে সারের অপচয়কে বন্ধ করা যায় এবং উপজাত হিসাবে পাওয়া যায় জ্বালানীকে। দ্বিতীয়ত প্রাণীর মলমূত্র ও আবর্জনাকে এইভাবে কাজে লাগানোর ফলে পরিবেশ ও দূষণ-মুক্ত হয়।

পরিশেষে উল্লেখ করতে হয় যে কঠিন, তরল বা গ্যাসীয় যে-কোন ধরণের জ্বালানী হোক না কেন, ওর গুণগত মান নির্ভর করে তাপউৎপাদন ক্ষমতার উপর। তাপউৎপাদন ক্ষমতা মাপা হয় ব্রিটিশ তাপীয় এককে বা B.T.U.-তে। এক পাউণ্ড কঠিন কিংবা তরল জ্বালানী অথবা এক ঘনফুট গ্যাসীয় জ্বালানী যত B.T.U. একক তাপ উৎপাদন করতে সক্ষম হয় সেইটিই জ্বালানীর তাপনমূল্য বা ক্যালরিফিক ভ্যালু। দেখা গেছে, সব জ্বালানীর তাপনমূল্য এক নয়। কারও বেশী আর কারও বা কম। যার তাপনমূল্য বেশী সেইই উৎকৃষ্ট জ্বালানী।

আজকের দিনে জ্বালানীর চাহিদা ক্রমশঃ এত বেড়ে চলেছে যে, অদূর ভবিষ্যতে কাঠ, কয়লা, পেট্রোলিয়াম প্রভৃতি সে চাহিদা মনে হয় পূরণ করতে পারবে না। যে-কোন খনিজ সম্পদকে নিঃশেষ করে দেওয়াও বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তাই বিজ্ঞানীরা চিন্তিত। সৌরশক্তি থেকে শক্তি আহরণের জন্য তাঁরা তৎপর হয়ে উঠেছেন। আবিষ্কৃত হয়েছে সৌর উনান, সৌর ব্যাটারী ইত্যাদি। তবে এগুলির ব্যবহার এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে।

কঠিন বিস্ফোরক পদার্থ থেকে আণবিক বিস্ফোরণ

তোমাদের একটি প্রিয় উৎসব দিয়েই কথাটা আরম্ভ করা যাক। সে উৎসব আলো ঝলমল ও শব্দমুখর দীপালির উৎসব। কয়েকদিন আগে থেকে দোকানে দোকানে দোকানদাররা থরে থরে সাজিয়ে রাখে কত রকমের বোম, পটকা, তুবড়ী, হাউই প্রভৃতি। তোমরা সেগুলো কিনে আনো আর দীপালির রাতে আকাশ-বাতাসকে শব্দে শব্দে কাঁপিয়ে তোল, বারুদের ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় মাথার উপরটাকে কুয়াসার আবরণের মত একটা আবরণে ঢেকে ফেল। তীব্র কান-ফাটানো শব্দ পরিবেশকে ভয়ানকভাবে দূষিত করে বলে তোমরা কেউই ব্যাপারটা পছন্দ করো না, শুধু আনন্দের অংশ নিতে এগিয়ে আসো বোম-পটকা হাতে করে, তাই না ?

পটকা ফাটাতে গিয়ে কেউ কেউ নিশ্চয়ই ভাব, গোটা স্থপুরির মত ছোট্ট একটা পটকা কিংবা হাতের মুঠোর মধ্যে পুরে ফেলা যায়—এমন একটা বোমার ভেতর থেকে এত শক্তি কোথা থেকে আসে ? অথবা এক হাতের চেয়েও কম লম্বা একটা সরু কাঠির ডগায় আঙ্গুলের মত মোটা ও ছোট নলের তলায় আগুন গুঁজে দিলে কেমন করে তীব্র বেগে ছুটে যায় আকাশ পানে ? কেমন করে তুবড়িরা ভুস ভুস করে আগুনের ফুলকি ঝরায় ?

এসবের মূলে আছে বারুদ—এক কঠিন বিস্ফোরক পদার্থ। অগ্নিসংযোগে বারুদের মধ্যে তীব্র বিস্ফোরণে পটকা সশব্দে ফেটে যায় এবং আগুনের হঙ্কার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। হাউইর নলের ভেতরে বিস্ফোরণ ঘটলে সেটি ফেটে যায় না, তবে বিস্ফোরণের ফলে উৎপন্ন গ্যাস নলের তলায় সরু ছিদ্র পথে প্রবলবেগে বেরিয়ে আসে এবং বিপরীতমুখী ক্রিয়ায় হাউই উর্ধ্বপানে ধাবিত হয়। তুবড়ির ভেতরে বারুদের সঙ্গে মিশে থাকা অ্যালুমিনিয়াম ও লোহার মিহি গুঁড়া প্রজ্জলন্ত-ভাবে আত্মপ্রকাশ করে।

বারুদ নামটা তোমাদের অজানা নয়। এর ব্যবহার আতসবাজীতে প্রত্যক্ষ করে মজা পেয়েছো, গোলাবারুদ রূপে ব্যবহার দেখে ভীত হয়েছো, পটকা ফাটাতে গিয়ে অল্প স্বল্প দুর্ঘটনায়ও পড়েছো কেউ কেউ। আর তখনই মনে আসে, এই ভয়ঙ্কর জিনিসটাকে মানুষ কেমন করে আবিষ্কার করেছিল এবং ব্যবহার করেছিল কিভাবে।

বারুদকে কে কবে যে আবিষ্কার করেছেন, সে তথ্য অজ্ঞাত থেকে গেছে।

কেউ বলেন খ্রীষ্টজন্মের দু-তিনশ' বছর আগে গ্রীকরা বারুদ জাতীয় কঠিন বিস্ফোরক প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন। কেউ বলেন বারুদের স্রষ্টা বাইজেনটাইনরা। আবার কারও কারও মতে খ্রীষ্টজন্মের অনেক পরে চীনারাই প্রকৃত বারুদ তৈরি করেছিলেন। তবে যঁারাই সেকালে বারুদ তৈরি করে থাকুন না কেন, ওর ব্যাপক ব্যবহার ছিল না বা তার উপাদানও আজকের মত ছিল না। শোনা যায়, বারুদ দিয়ে আতসবাজী তৈরি প্রথম চীনাদের মাথায় এসেছিল। আর যুদ্ধাস্ত্র তথা অগ্নিবাণ তৈরির পরিকল্পনাও তাঁদের।

অগ্নিবাণের নাম শুনে নিশ্চয়ই তোমরা অবাক হচ্ছো! না, অবাক হওয়ার মত বিশেষ কিছু নেই। চীনারা হাউই তৈরি করতেন আর হাউইর মাথায় একটা লোহার তীর পরিয়ে দিতেন। প্রতিপক্ষকে লক্ষ্য করে হাউইর তলায় আগুন ধরালে তীরটি সবেগে ছুটে যেতো এবং প্রতিপক্ষকে বিদ্ধ করতো।

বারুদের ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয় চতুর্দশ শতাব্দী থেকে। ১৩২৮ খ্রীষ্টাব্দে বারথোল্ড সোয়ার্জ নামে এক বিজ্ঞানী কাঠকয়লা, সোরা বা পটাসিয়াম নাইট্রেট এবং গন্ধক বা সালফারকে একত্রে বিশেষ অনুপাতে মিশিয়ে প্রথম প্রকৃত বারুদ তৈরি করতে সক্ষম হন। তবে কাঠকয়লার গুঁড়ো এবং সোরাকে মেশালেও বারুদ পাওয়া যাবে। কারণ, কাঠকয়লার গুঁড়োকে পর্যাপ্ত অক্সিজেনের সংস্পর্শে উত্তপ্ত করলে বিস্ফোরণ ঘটে। সোরা যেহেতু পটাসিয়াম, নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের একটি যৌগিক। কাঠকয়লা ও সোরার মিশ্রণে অগ্নি সংযুক্ত হলে প্রথমে সোরা বিয়োজিত হয়ে প্রচুর অক্সিজেন উৎপন্ন করে এবং সেই অক্সিজেন কাঠকয়লার বিস্ফোরণ ঘটাতে সক্ষম হয়।

পরে বারুদের উন্নতি হয়েছে অনেকখানি। কঠিন বারুদকে গুঁড়া করে ব্যবহার করা হয়েছে মারণাস্ত্রে। সত্য কথা বলতে কি, মানবসভ্যতার ইতিহাসে এই বারুদই প্রথম বহে এনেছে সন্ত্রাস। যুদ্ধক্ষেত্রে গোলাবারুদ হিসাবে এর প্রথম ব্যবহার শুরু হলেও পরের দিকে তৈরি হয়েছে নানা ধরণের বোমা। ভাঙ্গা কাচ ও ধাতব পাতের টুকরা দিয়ে তৈরি বোমা যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের সৈন্যদের ছিন্নভিন্ন করে দিত। এর ব্যবহার অবশ্য এখনও শেষ হয় নি। আজও কামান ও বন্দুকে এবং হরেক রকমের বোমা প্রস্তুতিতে ব্যবহার করা হচ্ছে।

কঠিন বিস্ফোরকের অনেক পরে তরল বিস্ফোরকের হয়েছে আবিষ্কার। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে একরকম আকস্মিকভাবে নাইট্রিক অ্যাসিডের সঙ্গে চিনি মিশিয়ে হেনরী ব্রেকনট নামে এক রসায়নবিদ প্রথম হস্তগত করেন তরল বিস্ফোরককে। ঐ বিস্ফোরকের বৈশিষ্ট্য যে, ওতে আগুনের প্রয়োজন হয় না। কেবল দুটি

পদার্থকে একসঙ্গে মিশিয়ে দিলেই বিস্ফোরণ ঘটে।

নতুন বিস্ফোরকের জন্মলাভ মাত্রই অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। বুঝিবা মজা পেলেন অনেকেই। বিনা আগুনেই বিস্ফোরণ এবং অগ্নিপ্রজ্জ্বলন! নাইট্রিক অ্যাসিডের সঙ্গে অন্য কিছুকে মিশিয়ে আরও ভালভাবে বিস্ফোরণ ঘটানো যায় কিনা—সে বিষয়ে অনেকে উৎসাহী হয়ে উঠলেন এবং অল্পকালের মধ্যে আস্কানি ও সোব্রেরো নামে দুজন বিজ্ঞানী নাইট্রিক অ্যাসিডের সঙ্গে গ্লিসারিন মিশিয়ে আরও ভাল বিস্ফোরকের সন্ধান লাভ করলেন। প্রকৃতপক্ষে বারুদ অপেক্ষা ভয়াবহ বিস্ফোরকের জন্ম হল সেদিন। নাম হল নাইট্রোগ্লিসারিণ।

নাইট্রোগ্লিসারিণের ব্যবহার ছিল অত্যন্ত ভীতিপ্রদ। যখন তখন যে-কোন অবস্থায় ওকে সহজে বহন করা যেত না। প্রখ্যাত বিজ্ঞানী আলফ্রেড বার্ণাড নোবেল একদিন সে অসুবিধাকে দূর করলেন। কাইজেলগার নামক এক ধরণের সচ্ছিদ্র মাটিতে নাইট্রোগ্লিসারিণকে শোষণ করিয়ে এক অদ্ভুত ও আশ্চর্যজনক বিস্ফোরক উপহার দিলেন। নাম হল ডিনামাইট। পূর্বের সমূহ বিস্ফোরণ এবার হার মানতে বাধ্য হল ডিনামাইটের কাছে।

আলফ্রেড নোবেল দীর্ঘকাল ডিনামাইটকে নিয়ে গবেষণা করেছিলেন এবং একে একে আবিষ্কার করেছিলেন বহু ধরণের ডিনামাইট। সবশেষে গানকটনকে ব্যবহার করে যে ডিনামাইট আবিষ্কার করলেন তার এমন প্রচণ্ড ক্ষমতা হল যে একটা বিশাল প্রাসাদকে মুহূর্তে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করতে সক্ষম হল। আকারেও হল বেশ ছোট এবং নিরাপদে ব্যবহারের ব্যবস্থা হওয়ায় চারদিকে সাড়াও পড়ে গেল।

ডিনামাইটের ভয়াবহ ক্ষমতা দেখে নোবেল নিজেই হয়ত সেদিন বিস্মিত হয়েছিলেন এবং বুঝেছিলেন, তিনিই শান্ত পৃথিবীর বুকে অশান্তির প্লাবন আনছেন। তাই মনে হয়, তাঁর সঞ্চিত অগাধ অর্থকে দান করেছিলেন বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারকে সম্মান জানানোর জন্যে এবং একটি পুরস্কার রেখেছিলেন পৃথিবীর বুকে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে যিনি এগিয়ে আসবেন তাঁর জন্যে।

ডিনামাইট শুধু ধ্বংসাত্মক নয়, কল্যাণকর কর্মেও ওকে প্রথম থেকে নিয়োগ করা হয়ে আসছে। পাহাড় ফাটিয়ে ভেতর দিয়ে রাস্তা করা, ভূগর্ভে খনিজ তৈল অনুসন্ধান করা, নদীর বুকে সেতু নির্মাণের জন্য থাম গাঁথতে গর্ত খোঁড়া, ইত্যাদি অনেক সহজ হয়েছে।

নোবেল ডিনামাইট আবিষ্কার করেন ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে। সেই থেকে প্রায় একশ বছর কাল কঠিন ও তরল বিস্ফোরকের যুগ। এগুলোর কল্যাণকর দিক

ছিল নিতান্ত গৌন, অধিকাংশকে ব্যবহার করা হতো সামরিক প্রয়োজনে। এদের নানাভাবে রূপান্তরও সাধিত হয়েছিল। প্রথম বিশ্বমহাসমরে এবং দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাসমরের গোড়ার দিকে যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহৃত সমূহ মারণাস্ত্রের চাহিদা মিটিয়ে ছিল কঠিন ও তরল বিস্ফোরক।

এর পরেই আসে ঐতিহাসিক সেই ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জুলাই তারিখটি। ঐ দিনটিতে প্রথম মার্কিন বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের সমবেত প্রচেষ্টায় পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। তারপর অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই ওকে প্রয়োগ করা হয় জাপানের দুটি সমৃদ্ধিশালী নগর হিরোসিমা ও নাগাসাকির উপর। এক-রকম নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল শহর দুটি। আর পৃথিবীর শান্তিকামী মানুষ ঐ বীভৎসতা দেখে শিউরে উঠলেন। বিশ্বে এক নতুন সন্ত্রাসের হলো সূচনা।

পরমাণু বোমার জন্য কোন বিস্ফোরক পদার্থের প্রয়োজন হয়নি। ইউরেনিয়াম —২৩৫-এর ভাঙ্গনে যে প্রচণ্ড শক্তি নির্গত হয় তাকেই লাগানো হয়েছিল কাজে। কোন একক ব্যক্তির দ্বারাও এটির আবিষ্কার সম্ভব হয়নি। পরমাণু বিজ্ঞানীদের গবেষণাবলীকে অবলম্বন করে অজস্র অর্থব্যয় এবং সহস্র সহস্র বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ এবং কর্মীদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় একদিন আত্মপ্রকাশ করেছিল। নির্মাণ কৌশলও রেখেছিল গুপ্ত। পরে জানা গেছে, শৃঙ্খল বিক্রিয়ায় উৎপন্ন তেজকে নিয়ন্ত্রিত না করলে এইভাবে প্রচণ্ড তাপশক্তির উদ্ভব হয়।

পরমাণু বোমা বিস্ফোরণের কয়েক বছরের মধ্যেই আত্মপ্রকাশ করে পরমাণু বোমা অপেক্ষাও বহুগুণে শক্তিধর মারণাস্ত্র। তারপর সেই পরমাণু শক্তিকে কাজে লাগিয়ে আবিষ্কৃত হয়েছে হাইড্রোজেন বোমা, নিউট্রন বোমা প্রভৃতি কত হরেক রকমের বোমা। এদের ধ্বংসকরার ক্ষমতা এত প্রচণ্ড যে এদের মাত্র কয়েকটিকে প্রয়োগ করলে পৃথিবীর জীব ও উদ্ভিদজগৎ সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে এবং পৃথিবীর পরিবেশটারও স্থায়ী পরিবর্তন আসতে পারে। তাই চিন্তিত পৃথিবীর শান্তিকামী মানুষ মাত্রই। তাঁদের জিজ্ঞাসা, যে বিজ্ঞান মানুষকে দিয়েছে এত সুখ, এত স্বাচ্ছন্দ্য এবং নিরাপত্তা সেই বিজ্ঞান কি শেষে কবর রচনা করবে মানুষের!

পরমাণু বোমার নির্মাণ কৌশল পৃথিবীর সব দেশের ভাণ্ডারে জমা পড়লে এবং প্রত্যেকে স্বনির্ভর হয়ে উঠলে কোন ভয় নেই। কিন্তু ওর নির্মাণ পদ্ধতি বিরাট কর্মযজ্ঞ ছাড়া কিছু নয় এবং প্রয়োজন হয় অজস্র অর্থের। তাই সব দেশ এগিয়ে আসতে পারছে না। হয়ত এই কারণে পৃথিবীর শক্তিধর দেশগুলি ভেতরে ভেতরে মারণাস্ত্র তৈরিতে যেন প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছে।

এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে প্রত্যেকের বিজ্ঞান-সচেতন হওয়া ছাড়া উপায় নেই। সবাইকে বিশেষত তরুণদের বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলিকে আয়ত্ত করতে হবে এবং প্রকৃত বিজ্ঞানী হয়ে উঠতে হবে। শক্তির অহংকার যাদের, তাদের কানে ভাল কথা হঠাৎ পৌঁছায় না। ভাবে, এ কেবল দুর্বলের নিবেদন। তাই দেশ ও জাতিকে উন্নত করতে এবং দেশের অখণ্ডতা রক্ষা করতে বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার এবং বিজ্ঞানের মাধ্যমে নতুন নতুন শক্তির সন্ধান ছাড়া দ্বিতীয় কোন উপায় নেই।

মনে রাখতে হবে যে, বিজ্ঞানের চরিত্রটাই হচ্ছে আলাদা। যখন যে দেশ প্রকৃত বিজ্ঞান অনুশীলনে যত্নবান হয়ে ওঠে তখনই তার হয় জয় জয়কার। বিজ্ঞান অনুশীলনের অবনতি ঘটলে জাতির জীবনে নেমে আসে অন্ধকার। তার স্বাতন্ত্র্য এমনকি অস্তিত্বও বিপন্ন হয়ে উঠে। প্রাচীন মিশর, মেসোপটেমিয়া, গ্রীস, ভারত প্রভৃতির উত্থানের মূলে ছিল একমাত্র বিজ্ঞান-চিন্তা। অপরদিকে ওদের শুদ্ধ বিজ্ঞানর্চা যখনই ব্যাহত হয়েছে, অপর দেশের বিজ্ঞান গবেষণাকে আয়ত্ত করার প্রবণতা নষ্ট হয়েছে তখনই তাদের ঘনিয়ে এসেছে দুর্দিন। কে না জানে মাত্র কয়েকটা কামান বন্দুকের ভয় দেখিয়ে বাবর দিল্লীর সিংহাসনটা হাতের মুঠোয় পুরে নিয়েছিলেন? বিজ্ঞানে উন্নত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা পাকা ফলের মত লুফে নিয়েছিল ভারতকে?

অপরদিকে বিশ্বের মধ্যে যারা ছিল দীন, সেই পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে অবলম্বন করেছিল বলেই বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিরূপে পরিচিত হতে পেরেছিল এবং এখনও তারা স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। মাত্র কয়েকশ বছরের মধ্যেই মধ্যযুগের সমূহ জড়তাকে কাটিয়ে যেন লেলিহান অগ্নিশিখার মতই আত্মপ্রকাশ করেছিল—যাদের দেখে চমকে উঠেছিল সারা বিশ্ব।

বর্তমানে বিজ্ঞানের ভয়াবহতার কথা চিন্তা করে নিরুৎসাহ হওয়ারও কোন কারণ নেই। মানুষের ইতিহাসে এর আগেও ঘটেছে কত ভয়াবহ ঘটনা। যুগের পরিপ্রেক্ষিতে যে জাতিগুলি একদিন লোহাকে আয়ত্ত করেছিল, তাদের অত্যাচারেও দেখা দিয়েছিল অনুরূপ সন্ত্রাস। গোলাবারুদ আবিষ্কারের পরে মানুষ ধরে নিয়েছিল, এবার মানবসভ্যতা ধ্বংস হল বলে। সেই একই কথার পুনারাবৃত্তি হচ্ছে আজ—পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কারের পরে। ভবিষ্যতে অ্যান্টিম্যাটারকেও কাজে লাগাতে পারে এবং তখনও এই একই কথার পুনরাবৃত্তি ঘটবে। কিন্তু অতীতে মানবসভ্যতা যখন মুছে যায়নি তখন আজও যাবে না। বরং আরও এগিয়ে যাবে—যেমনটি হয়েছে প্রস্তর যুগের ও তাম্র যুগের পরে।

অতএব পরমাণুর ভয়ঙ্কর ও বিধ্বংসী শক্তিকে দেখে ভয় পাওয়ার কিছুই নেই। এখনই ওকে মানুষের কল্যাণে নিয়োগের আয়োজন চলেছে এবং অনেকখানি সফলও হওয়া গেছে। মানবসভ্যতার ক্ষেত্রে এটিকে ধ্বংসের চরম মুহূর্ত বলে ভাবার কোন কারণ নেই। সাময়িক এক দুর্যোগ মনে করা যেতে পারে।

মহর্ষি জরথুশস্ত্র শিষ্যদের বলেছিলেন, দুর্যোগ হচ্ছে প্রাকৃতিক নিয়ম। আবার কোন দুর্যোগের দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার ক্ষমতা নেই। অচিরে ওর অবসান হয় এবং প্রকৃতি আরও সুন্দর এবং আরও মনোরম হয়ে উঠে।

বিজ্ঞানও তার ব্যতিক্রম নয়। আজকের দুর্যোগ অবশ্যই কেটে যাবে এবং সূচনা হবে নতুন প্রভাতের। দুর্যোগের ভয়ে ভীত হয়ে যারা ঘরের কোণে চুপটি করে লুকিয়ে থাকে সেই-ই আগে বরণ করে মৃত্যুকে। আর দুর্যোগকে অতিক্রম করতে যে সাহসে বুক বেঁধে এগিয়ে যায় তার মৃত্যু হয় না। তারাই প্রকৃতপক্ষে বীর এবং তারাই অমর।

অতএব সবশেষে বলতে হয় যে বিজ্ঞান যেভাবে দ্রুত এগিয়ে চলেছে, তোমাদেরও তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে আরও দ্রুতগতিতে এগিয়ে যেতে হবে। বিজ্ঞানের বিচিত্র গতিকে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। প্রত্যক্ষ করেছি তার অগ্রগতিকে। সেক্ষেত্রে মানুষকে স্থবির হয়ে পড়ে থাকলে চলবে না। কেননা স্থবিরত্ব হচ্ছে মৃত্যুর লক্ষণ। ভারতীয় আর্য-ঋষিদের সেই মহামন্ত্রকে পাথেয় করতে হবে—**চরৈবেতি, চরৈবেতি।**